একটি
THE BUSINESS STANDARD
প্রকাশনা

ইজেল

০৪ ভাদ্র ১৪৩০ | সংখ্যা ৯৭
SATURDAY 19 AUGUST, 2023

স্বর্ণলতার রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী হবার কথা ছিল!

গৌতম মিত্র

আসামের এই মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী হতে পারতেন! মেয়েটির নাম স্বর্ণলতা।

স্বর্ণলতার বাবা গুণাভিরাম বরুয়া ছিলেন 'আসামবন্ধু'-র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। সুকিয়া স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উদ্যোগে বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৯ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। স্ত্রী ব্রজসুন্দরীর অকাল প্রয়াণের পর তিনি দুই সন্তানের জননী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করেন।

স্বর্ণলতা গুণাভিরামের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। তাঁর ভাই জ্ঞানদাভিরাম ঠাকুরবাড়ির মেয়ে লতিকা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে লতিকার মেয়ে ইরাকে বলেছিলেন:

'তোর পিসিকে তো পাইনি, তবে তুই কাছে থাকলে ছবি তোলায় আপত্তি নেই।'

কেন খারিজ হয়েছিল বিবাহ প্রস্তাব?

শুনলে অবাক হতে হয়, কারণ ছিল গুণাভিরামের বিধবা বিবাহ। খারিজ করেছিলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রূপে গুণে সত্যিই অনন্য ছিলেন স্বর্ণলতা। আসামের প্রথম মহিলা সাংবাদিক বলা হয় তাঁকে। তৎকালীন নারী মুক্তি আন্দোলনেরও পুরোধা ছিলেন তিনি। জানি না ওঁর লেখা কোনো বই আছে কি না।

কলকাতার বেথুন কলেজে পড়েছেন, বাবার বিভিন্ন কাজে সহযোগী হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হয়নি!

যদি স্বর্ণলতার সঙ্গে বিয়ে হতো রবীন্দ্রনাথের, আমরা হয়তো এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে পেতাম।

তবে স্বর্ণলতার জীবন নিয়ে লেখা হয়েছে একটি অসাধারণ উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' লেখক তিলোত্তমা মিশ্র।

প্রচ্ছদ: সব্যসাচী মিস্ত্রী

সাপ্তাহিক ইজেল, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর একটি প্রকাশনা, ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০। বিজ্ঞাপন: ০১৭১১৫৪৭০৫০ ✉ tbs.features@gmail.com ⊕ tbsnews.net

মোল্লার দৌড়

সাগুফতা শারমীন তানিয়া

অল্প বয়সে আব্বার কাছে পড়তে বসা ছিল বিভীষিকা। সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়িতে সাধারণত অতিথি আসত না। নাটক-সিনেমা না দেখে সন্ধ্যার বিশ্বস্ত-কাল কঠোর তত্ত্বাবধানে আমাদের পড়াত আব্বা। ইংরেজি-অঙ্ক-হাতের লেখা- বাড়ির কাজ-পরিবেশ পরিচিতি কিছুই বাদ পড়ত না। প্রথমেই আব্বা খুঁজত কী করে আমাদের দুই ভাইবোনকে একচোট ধোলাই দিয়ে নেয়া যায়। আসলে ভাগ্যদোষে আমিই আব্বাকে মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা গল্প পড়ে শুনিয়েছিলাম। হোজ্জার মেয়ে কুয়োয় ঘটিতে করে পানি তুলতে যাচ্ছে, যাওয়ার আগেই হোজ্জা লাগিয়েছে এক চড়। মেয়ে তো হতবাক, কুয়োয় যায়নি এখনো, ঘটি ফেলে দিয়ে হারিয়েও ফেলেনি, তাহলে কিসের জন্য এমন চড়? হোজ্জা জবাব করেছিল, 'ঘটি হারালে চড় দিয়ে আর কী হবে, আগেভাগে চড় দিয়ে রাখলে ভয়ে তুমি ঘটি হারাবে না!' গল্পটা আব্বার খুব মনঃপূত হয়েছিল, আব্বাও তেমনি রীতিতেই বিশ্বাস করত। ভাই নিচু গলায় আমাকে প্রায়ই বলত, 'আর কোনো গল্প শোনাতে পারলি না?' আজ যা লিখব, সেটা মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জাকে নিয়ে আমার কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতির গল্প, হোজ্জাকে নিয়ে বিশদ গবেষণা এত অল্প পরিসরে সম্ভবও নয়, আমি সে কাজের যোগ্য ব্যক্তিও নই।

আমাদের প্রথম হোজ্জার বইটি কার সংকলিত ছিল, ঠিক মনে নেই; সম্ভবত লেখকের নাম ইফতেখার রসুল জর্জ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার থেকে বের করা বই। প্রাইমারি ক্লাসের দুরবগাহ স্মৃতি থেকে লিখছি, ভুলচুক হলে ক্ষমা-ঘেন্না করে দেবেন। এরপর বাড়িতে এল 'মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প', সেটা সত্যজিৎ রায়ের। গোলাপি প্রচ্ছদে মোল্লা দুহাত বাড়িয়ে ধরেছেন আপামর পৃথিবীর দিকে (তুর্কি, ফার্সি, আলবেনীয়, আর্মেনীয়, আজারবাইজানীয়, আফগান, বসনিয়ান, বুলগেরিয়ান, কুর্দি, রোমানিয়ান, সার্বীয়, রুশ... কত জাতের লোককথার চরিত্র হিসেবে মিশে আছেন তিনি, কতই না উন্মুক্ত তাঁর আলিঙ্গন), নাকটা টিয়েপাখির চঞ্চুর মতো, মুখ টেপা কিংবা ওটা মুচকি হাসি, মাথায় মস্ত পাগড়ি। সত্যজিৎ রায়ের বইটির ফ্ল্যাপে লেখা–'মোল্লা নাসিরুদ্দীন যে ঠিক কেমন লোক ছিলেন সেটা তাঁর গল্প পড়ে বোঝা মুশকিল। এক এক সময় তাঁকে মনে হয় বোকা, আবার এক এক সময় মনে হয় ভারী বিজ্ঞ। তোমাদের কী মনে হয় সেটা তোমরাই বুঝে নিও।' নিলাম। দেশ-এ প্রায়ই মোল্লা নাসিরুদ্দিনের চুটকি বের হতো। ওই পাতাটুকুন পড়বার অনুমতি পেতাম। দূরদর্শনে মোল্লার কাহিনি দেখানো হতো।

তখন তো হাসিরই বয়স, হাসতে ভালোবাসতাম আমরা। ঠগ আর বাটপারের গল্প পড়ে হাসতাম, বাঙালির হাসির গল্প পড়ে হাসতাম। অমর চিত্রকথার বীরবল ভারি চৌকস, গোপাল ভাঁড় বড্ড ভাঁড় আর মাঝেমধ্যে ভারি অশ্লীল, মোল্লা নাসিরুদ্দিন দিব্যোন্মাদ–যেন পাগলা দাশু বয়স্ক হলে এমনটি হবে। দুষ্টুমির ভাঁজে ভাঁজে পাগলামি, পাগলামির তলায় প্রজ্ঞা। শিশুকে যে অ্যাবসার্ড টানে, তার সাক্ষী হোজ্জার প্রতি আমাদের পক্ষপাত। খোদার হাতে হোজ্জা বাড়ি পাহারার সব ভার দিয়ে কোথাও রওনা হয়েছেন, ফিরে এসে দেখলেন বাড়ির সর্বস্ব চুরি গেছে, এমনকি দরজার পাল্লাটা অব্দি খোয়া গেছে। তিনি সোজা চলে গেলেন ইবাদতখানায়, তার দরজা খুলে এনে বাড়িতে লাগালেন। উপরঅলা দায়দায়িত্ব পালন করেননি, তাই তার ঘরের দরজা নিয়ে এসে মোল্লাবাড়িতে লাগানোই সমীচীন। হেসে গড়াগড়ি দিতাম আমি আর ভাই। খোদার সঙ্গে অমন না হলে কি আর খোদা আপন হতে পারেন! মাথার মাপের চেয়ে বড় পাগড়ি, আর গাধার পিঠে উল্টো সওয়ার মোল্লা, আমাদের ছোটবেলার চনমনিয়া স্মৃতির অংশ হয়ে রইলেন।

ভাবুন সেই গল্পটার কথা, বাজার থেকে মোল্লা এক সের গোশত এনে বউকে বলেছেন কাবাব করতে, বেশ পেট পুরে খাবেন তিনি। রান্না করতে করতে খুশবু ছুটেছে খুব, লোভে লোভে হোজ্জার বউ কাবাব চাখতে গিয়ে পুরোটাই খেয়ে ফেলেছেন।

হোজ্জার গল্পগুলো খুব ছোট ছোট, শেষ হবার পর অনেক সময় শিক্ষণীয় কিছু ছিল কি না, তা বোঝা যায় না। কিন্তু সেই ধাঁধাই যেন পাঠককে ছুটিয়ে নেয়। তুবড়ির ফুলকি যেমন অন্ধকার আকাশে আলপনা এঁকেই নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন ধরুন, গাঁয়ের লোকে ভাবল–হোজ্জাকে শায়েস্তা করবে। মশকরা করবে বলে তারা হোজ্জাকে বলল–'আমাদের কিছু তত্ত্বকথা শোনান।' নির্দিষ্ট দিনে হোজ্জা মসজিদে তত্ত্বকথা শেখাতে হাজির হলেন, জিজ্ঞেস করলেন–'ভাইসকল, তোমাদের আমি কী শেখাব, তোমরা কি তা জানো?' গাঁয়ের লোকে ভান করে বলল–'আমরা তো কিছুই জানি না!'

'এত অজ্ঞ লোককে আমি আর কী শেখাব!' বলে হোজ্জা গটগটিয়ে মসজিদ থেকে ফিরে গেলেন।

গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা, তারা পরের জুমাবারে আবার ডেকে আনল হোজ্জাকে। হোজ্জা যখন জিজ্ঞেস করলেন–'তোমরা কী শিখবে জানো?' সেয়ানার দল জবাব দিল–'খুব জানি!' হোজ্জা বললেন, 'তবে আর আমার শিখিয়ে কী লাভ!' আবার চলে গেলেন। এইবার গাঁয়ের লোকে আবার ডাকল হোজ্জাকে। হোজ্জা এসে একই প্রশ্ন করলেন, বুদ্ধি খাটিয়ে গ্রামের অর্ধেক লোক জবাব দিল–জানি, অর্ধেক বলল–জানি না! হোজ্জা নিমেষে সমাধা করে দিলেন–'যারা জানো, তারা বাকি যারা জানে না, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও।' মনে আছে আমাদের সেই হোজ্জা সংকলনে এই গল্পটা পড়ে উত্তরের ঘরে ছোট ফুফু হাসতে হাসতে কুটিকুটি হতো। সাধে কি আর দার্শনিকেরা হোজ্জাকে ডেকেছেন–'অতুলনীয় গুরু'!

গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা, তারা পরের জুমাবারে আবার ডেকে আনল হোজ্জাকে। হোজ্জা যখন জিজ্ঞেস করলেন–'তোমরা কী শিখবে জানো?' সেয়ানার দল জবাব দিল–'খুব জানি!' হোজ্জা বললেন, 'তবে আর আমার শিখিয়ে কী লাভ!' আবার চলে গেলেন। এইবার গাঁয়ের লোকে আবার ডাকল হোজ্জাকে। হোজ্জা এসে একই প্রশ্ন করলেন, বুদ্ধি খাটিয়ে গ্রামের অর্ধেক লোক জবাব দিল–জানি, অর্ধেক বলল–জানি না! হোজ্জা নিমেষে সমাধা করে দিলেন–'যারা জানো, তারা বাকি যারা জানে না, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও।' মনে আছে আমাদের সেই হোজ্জা সংকলনে এই গল্পটা পড়ে উত্তরের ঘরে ছোট ফুফু হাসতে হাসতে কুটিকুটি হতো। সাধে কি আর দার্শনিকেরা হোজ্জাকে ডেকেছেন–'অতুলনীয় গুরু'!

হোজ্জা এলে বউ বলেন–'বেড়ালটা সব মাংস খেয়ে গেছে।' ডাকো বেড়ালকে! হোজ্জা বেড়ালটাকে পাল্লায় চাপিয়ে দেখলেন বেড়ালের ওজন এক সের (এই গল্পের অলংকরণ দেখে আমরা যে কত হেসেছি!), জিজ্ঞেস করলেন–'এটাই যদি সেই বেড়াল হয়, তবে মাংস কোথায়? আর এটাই যদি সেই মাংস হয়, তবে বেড়াল কোথায়?' সত্তর-শেষ আশির দশকে যারা আমরা একের পর এক স্বৈরশাসকের ছায়ায় বড় হয়েছি, তাদের মনে রাষ্ট্রনায়ক আর রাষ্ট্র নিয়েও এমন হরেক প্রশ্ন উপস্থিত হতো।

এই মোল্লা নাসিরুদ্দিন কিন্তু বাদশাহর ধার ধারেন না। চটেমটে বাদশাহকে তিনি 'অপয়া' বলে বসেন, 'আমায় দেখে আপনি ছাব্বিশটা হরিণ মারলেন, আর আপনাকে দেখে আমি বিশ ঘা চাবুক খেলাম। অপয়া যে কে, সেটা বুঝতে পারলেন না?' সারা দেশে ফরমান জারি হলো, যারা বউকে ডরায় তারা হোজ্জাকে কর দেবে। মোল্লা দেখলেন, সবাই দেয় শুধু বাদশাহ দেন না। হোজ্জা বাদশাহর কাছে এসে গলা চড়িয়ে তুরানদেশের হুরীর বর্ণনা দিতে শুরু করলেন–গোলাপের মতো ঠোঁট, ঝিনুকের মতো কান! বাদশা যতই বলেন, 'আস্তে বলো হোজ্জা', হোজ্জা ততই গলা চড়ান। শেষে বাদশাহ কাতর গলায় বললেন, 'আস্তে বলো হোজ্জা, বেগম শুনতে পেলে সর্বনাশ হবে।' অম্লানবদনে হোজ্জা বললেন–'কাল থেকে আপনি আমায় কর দেবেন।' বাদশাহ তাঁকে পাঠালেন ভাল্লুক শিকারে, শিকারফেরত হোজ্জা বললেন, 'ভারি চমৎকার শিকারের অভিজ্ঞতা হলো।' হোজ্জা না ভাল্লুক মেরেছেন, না ধাওয়া করেছেন, এমনকি একটা ভাল্লুক চর্মচক্ষেও দেখেননি। তাহলে চমৎকার কিসে? 'ভাল্লুক শিকার করতে গিয়ে জানোয়ারের দেখা না পাওয়ার চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে?' কোথাও কোথাও উল্লেখিত রয়েছে, এই বাদশা নাকি স্বয়ং তৈমুর লং।

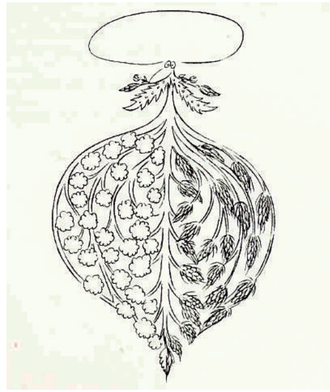

লোককাহিনির হোজ্জা অবশ্য কখনো দাস, কখনো কাজি, কখনো বাদশাহের মোসাহেব। নির্বিকার নিরুদ্বেগ হোজ্জা কখনো বাজারে গিয়ে তর্ক করছেন, কখনো হাম্মামখানায় শরীর দলাইমলাই করে আসছেন। তাঁর একটা বউ আছে, বউটিকে তিনি ভালোবাসেন–এমন দুর্নাম তাঁকে দেয়া যায় না।

কাজি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বৈরুতে লোকে তাঁকে সুফি সাধক হিসেবে মান্য করে, ব্রিটিশ ওরিয়েন্টারলিস্টরা আবার সেই সুফিত্ব স্বীকার করে না।

লোককাহিনির হোজ্জা অবশ্য কখনো দাস, কখনো কাজি, কখনো বাদশাহের মোসাহেব। নির্বিকার নিরুদ্বেগ হোজ্জা কখনো বাজারে গিয়ে তর্ক করছেন, কখনো হাম্মামখানায় শরীর দলাইমলাই করে আসছেন। তাঁর একটা বউ আছে, বউটিকে তিনি ভালোবাসেন–এমন দুর্নাম তাঁকে দেয়া যায় না। বন্ধুর প্রতিও তাঁর যে ভারী স্নেহ রয়েছে, তা-ও নয়, ভারী কিপ্টে লোক–প্রতিবেশীকে গাধা ধার দেয়া দূরে থাক কাপড় শুকোবার দড়িটাও ধার দেন না। আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে এই সেলজুক সুফি হোজ্জা কেমন, তা তো শুরুতেই বলেছি। ইদ্রিস শাহ তাঁর নাসিরুদ্দিন হোজ্জা-সংক্রান্ত বইয়ে লিখেছেন, কথিত আছে, বালক হোজ্জা খুব গল্পবলিয়ে ছিলেন, সহপাঠীরা পড়া ফেলে হোজ্জার গল্প শুনত, পড়ার সময় নষ্ট হতো। হোজ্জার ওস্তাদ বিরক্ত হয়ে তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন, 'যতই বিজ্ঞ হও না কেন, লোকে তোমায় নিয়ে চিরদিন হাসবে!' হোজ্জার জ্ঞান খানিকটা ওই আলোর পিদিমের মতো, যা তিনি বয়ে চলতেন পথে, কিন্তু চা-খানায় দেমাগ করে বলতেন–আমি আঁধারে দেখতে পাই। তোমরা যদি হোঁচট খাও, তাই আমার আলো বইতে হয়!' জুতো চুরির ভয়ে বিয়েবাড়িতে জোব্বার পকেটে জুতো রেখেছিলেন, লোকে ভেবেছিল–ওটা বই, হোজ্জা যেহেতু জ্ঞানী লোক। জিজ্ঞেস করেছিল–'ওটা কী বই মোল্লা সাহেব?' চোরের ভয়ে পকেটে জুতো বয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন কথা স্বীকার করতে হোজ্জার বাধছিল, তিনি বললেন–'ওই বইটার নাম "দূরদর্শিতা"।'

–তা বটে, তা বটে। কোন কিতাবখানায় পেলেন?

–মুচির কাছে।

ওইটাই হোজ্জার বিচক্ষণতার নমুনা, দেখতে দেখায় লুকোনো জুতোর মতো অথবা বইয়ের মতো। চিন্তামগ্ন হোজ্জা পথে চলেছেন, রাস্তার ছোকরারা তাঁকে ঢিল ছুড়ছে; বাজারে হরবোলা ময়নার অত দাম দেখে নিজের দামড়া মোরগটাকে বেচতে গেছেন হোজ্জা–দুটো কথা বলা ময়নার যদি অত দাম হয়, ভাবনায় নিমগ্ন মোরগের দাম তার চেয়ে বেশি হবে না কেন?

আমার দুই তুর্কি বন্ধু ছিল বিলেতে, জলিল আর ওইতুন। ওদের আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তুর্কি হোজ্জার কথা, বাঙালি ওষ্ঠে হোজ্জার নাম অনেকক্ষণ বুঝতে না পেরে অবশেষে তারা জোকার দিয়ে উঠেছিল–ওজা, ওজা? হোজ্জা যেমন বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুকে ঝোলের ঝোলের ঝোল খাইয়েছিলেন, ওদের ওজা নিশ্চয়ই এমনি করে মুখে মুখে অতি ব্যবহারে আমাদের হোজ্জা হয়েছেন, হয়েছেন মোল্লা, হয়েছেন মধ্য এশীয় 'এফেন্দি', উর্দুসাহিত্যে হয়েছেন খোজা, সিসিলিতে তথা ইতালীয় লোকসাহিত্যে হয়েছেন 'গ্যিওফা', হয়েছেন আরব দেশের চালাক 'জুহা', চীনের জ্ঞানী 'আফান্টি', মিসরের দুষ্ট 'গোহা'। শ্রীলঙ্কার তামিলরা তাঁকে চেনে নাসুদিন মুল্লা নামে, সোয়াহিলি অথবা ইন্দোনেশিয়াতে তিনি আবু-নওয়াজ। শোনা যায়, তিনি জন্মেছিলেন ১২০৮ সনে, সেলজুকদের যুদ্ধবিগ্রহের মাঝে, ইমাম হিসেবে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, ১২৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কোনিয়া বিভাগের আকসেহিরে তাঁর কবর হয়। আজো সেখানে প্রতিবছর জুলাই মাসে হোজ্জা উৎসব হয়। বুখারায় তাঁর ভাস্কর্য রয়েছে, রয়েছে শিনজিয়াং-এ, রয়েছে মস্কোতে। আমার মনে হয়, এই লোকচরিত যেন ভূপেন হাজারিকার সেই যাযাবরের মতো বিশ্বজনীন, যে গঙ্গা-মিসিসিপি-ভল্গার রূপ এক করে দেখেছে, ইলোরার রং মেখেছে শিকাগোর গায়ে, মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে গোর্কির কথা বলেছে। হোজ্জা তো সত্যিই আমেরিকা-সোভিয়েত-সেন্ট্রাল এশিয়া-চীনকে একসূত্রে বেঁধেছেন। কত দুরূহ এমন করে যুযুধান এতগুলো জাতকে সুতোয় বেঁধে এক করে রাখা আর আট শ বছর এভাবে জীবিত থাকা!

হোজ্জা নাকি বলতেন–'মনের আনন্দে থাকো, কিংবা চেষ্টা করো তেমনটি থাকতে, কাউকে না কাউকে তোমার সন্তুষ্টি উত্যক্ত করবেই; আর যদি তা না পারো, তাহলে একজন তো অসন্তুষ্ট হবেই।' ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় হোজ্জার গল্পটা বলছি। মোল্লা নাসরুদ্দিন হোজ্জার বাড়িতে চুরি হয়েছে। ভাবলেশশূন্য হোজ্জা এসে বসে আছে কবরখানায়। লোকে তাকে ডেকে বলছে–'মোল্লা তুমি কবরখানায় কী করছ? চোর ধরতেও বের হলে না! কাজির কাছেও বিচার দিলে না!' মোল্লা নাসরুদ্দিন হোজ্জা হেঁকে বললেন, 'চোরকে তো একদিন মরতেই হবে, তাই এখানে এসে অপেক্ষা করছি।' কেউ আপনার নামে মিথ্যে মোকদ্দমা দিচ্ছে, নাম কালো করছে, আপনার জিনিস চুরি করছে, বকেয়া টাকা দিচ্ছে না বা নিয়ে পালিয়েছে, কবরখানায় গিয়ে হোজ্জার মতো বসে থাকুন। এই নশ্বর জীবনের মানে পরিষ্কার হয়ে আসবে কবরখানার অকুল নির্জনতায়। এই হাজামতের জন্যে হোজ্জাকেও হয়তো মনে মনে একটি ধন্যবাদ দেবেন।

অলংকরণ: **মাহাতাব রশীদ**

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার ট্রেড সিক্রেট

আন্দালিব রাশদী

বিশাল তুর্কি খেলাফতের সবচেয়ে বোকা লোকটির নাম প্রায় সবাই জানতেন। তিনি নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। কিন্তু খলিফা বিশ্বাস করতেন না যে হোজ্জাই সবচেয়ে বোকা।

খলিফা মন্ত্রীকে বললেন, এটা হতে পারে না।

মন্ত্রী বললেন, সিকি আর আধুলির মধ্যে কোনটা বেশি মূল্যবান, এটা নাদান শিশুও জানে। কিন্তু জানে না ওই ব্যাটা আহাম্মক নাসিরুদ্দিন হোজ্জা।

খলিফা বললেন, সেটা যদি সত্যি হয়, এটা তাহলে আমার খেলাফতের জন্য অপমানজনক। এমন বোকা লোক আমার রাজত্বে থাকতে পারে না।

মন্ত্রী বললেন, তাহলে মহামান্য চলুন হাতেনাতে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে আসি।

খলিফা বললেন, উত্তম প্রস্তাব। নিজ চোখে না দেখে আমি বিশ্বাস করতে চাই না।

দুজন ছদ্মবেশ ধরে হোজ্জার ডেরায় হাজির হলেন।

যথারীতি ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে হোজ্জা তার ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

খলিফা নিজের ডান হাতের তালু তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তালুতে দুটি মুদ্রা। একটি আধুলি, একটি সিকি।

হোজ্জা দুজনের কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে খলিফার হাতের তালু থেকে সিকিটা তুলে নিলেন এবং দুই হাত তুলে দাতার ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল কামনা করলেন।

ফেরার পথে খলিফা মন্ত্রীকে বললেন, কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়। এমন আহাম্মকও আমার রাজত্বে আছে!

তবে খলিফা হোজ্জাকে রাজ্য ছাড়া করল না। কারণ তিনি তখনও হোজ্জা বোকা এ বিষয়ে পুরো নিঃশংসয় হতে পারলেন না।

একসময় খলিফা অবসর নিলেন। তার পুত্র খেলাফত চালাচ্ছেন। অবসরের দিনগুলোয় একদিন তার হাঠাৎ হোজ্জার কথা মনে পড়ল। মানুষটা আসলেই কি এত বোকা?

খবর নিয়ে জানলেন বার্ধক্যের কারণে হোজ্জাও আর ভিক্ষে করেন না, ডেরাতেই শুয়ে-বসে দিন কাটান। সাবেক খলিফা এবার নিজ পরিচয়েই সেখানে হাজির হয়ে হোজ্জাকে বললেন, আমি আর খলিফা নই। চাইলেও তোমাকে এ রাজ্য থেকে তাড়াতে পারব না। আমি তোমার বোকামির কথা শুনেছি, নিজে এসে হাতেনাতে প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু আমার এখনও মনে হয় না তুমি আসলে এত বোকা। এখন বলো তো তুমিও আর ভিক্ষে করো না। কাজেই তুমি তোমার এই বোকামির কারণটা আমাকে বলতেই পারো, তুমি আসলেই সিকি আধুলির পার্থক্য করতে পারতে না।

হোজ্জা বললেন, খলিফাতুল মুমেনিন। এটাই আমার ট্রেড সিক্রেট। মনে রাখবেন, একজন মানুষ চিরকালই অন্য একজন মানুষের বোকামিকে উপভোগ করে। আমি কোনো দিন আধুলি তুলে নিলে এভাবে কেউ আর সিকি ও আধুলি নিয়ে আমার বোকামি উপভোগ করতে আসত না। আমিও ক্রমাগত সিকি জমিয়ে আয়েশি জীবন যাপন করতে পারতাম না। বোকা সেজে বেঁচে থাকাটা অনেক সহজ।

সাবেক খলিফা তার হাতে কিছু ইনাম তুলে দিয়ে ফেরার পথে ভাবলেন, আসলে তার রাজত্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকটিই হচ্ছেন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা।

সফল গাধা ব্যবসায়ী

শুক্রবার সকালে গাধার হাট বসে। চমৎকার এক একটি গাধা নিয়ে হাজির হন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। সম্ভাব্য বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দামে গাধাটা বেচে খুশিমনে তিনি বাড়ি ফেরেন। হাটে সস্তায় হোজ্জার এরকম গাধা বেচা থেকে অন্য গাধা ব্যবসায়ীদের মনে হতে লাগল হোজ্জার কারণেই গাধার বাজার পড়ে যাচ্ছে।

একদিন এক ধনী গাধা ব্যবসায়ী হোজ্জার কাছে হাজির হয়ে বললেন, কেমন করে এটা সম্ভব? আমি পাইকারি দরে গাধা আনি, আমার লাঠিয়াল ভৃত্যরা জোর করে কৃষকের জমি থেকে ঘাস তুলে আনে, আমার ক্রীতদাসরা বিনে পয়সায় গাধা লালনপালন করে। আমি তবুও তোমার সাথে দামে কুলিয়ে উঠতে পারছি কেন? আমাকে রহস্যটা বলো।

হোজ্জা বললেন, খুব সহজ, আপনি শ্রমিকের মজুরি আর গাধার খাবার চুরি করেন। আমি কেবল গাধাটাই চুরি করে বাজারে নিয়ে আসি। এটাই আমার ট্রেড সিক্রেট।

হোজ্জার চোরাচালানি

হোজ্জাকে প্রায়ই তার গাধা ও বস্তাসহ সীমান্ত পারাপার হতে দেখে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের মনে হলো, এই বিশিষ্ট লোকটি নিশ্চয়ই চোরাকারবারিতে যুক্ত। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তার বস্তা তল্লাশির নির্দেশ দিলেন।

তল্লাশি করে পাওয়া গেল বস্তার ভেতর কেবল মাটি, অন্য কিছু নয়। আরও কয়েকবার তল্লাশির পর মাটি ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। মাঠপর্যায় থেকে প্রতিবেদন দেওয়া হলো, সম্ভবত বুড়ো হোজ্জার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এ জন্য গাধার পিঠে বস্তাভর্তি ধুলোবালি নিয়ে এপার-ওপার করেন। ধুলোবালি কোনো নিষিদ্ধ আইটেমও নয়, এর ওপর কোনো শুল্কও ধার্য করা হয় না।

শেষ দিকে পাগল মনে করে কেউ আর হোজ্জাকে ঘাঁটায়নি।

কিন্তু শুল্ক বিভাগের প্রধান পুরো ব্যাপারটা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন। এদিকে তিনি চাকরি থেকে অবসরে গেলেন। নাসিরুদ্দিন হোজ্জাও বস্তায় ধুলোবালি আনা-নেয়ার কাজ বন্ধ করে দিলেন।

শুল্ক বিভাগের প্রধান একবার তার সঙ্গে দেখা করে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আর চাকরিতে নেই, আপনিও ধুলোবালি টানার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যি করে বলবেন কি আপনি আসলে কী করতেন?

হোজ্জা বললেন চোরাচালান।

কী চোরাচালান করতেন?

তিনি বললেন গাধা। আমি গাধা নিয়ে এপারে আসতাম, পায়ে হেঁটে ওপারে চলে যেতাম। গাধার দাম পড়ে যাওয়ায় আর নিজেও বুড়ো হয়ে যাওয়ায় ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছি।

শুল্ক বিভাগের প্রধান বললেন, ধুলোবালি?

হোজ্জা বললেন, ওটাই আমার ট্রেড সিক্রেট।

হোজ্জার চাকরি

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা আবার চাকরির আবেদন করলেন। সিলেক্টেট হলেন, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, মৌখিক পরীক্ষাতেও উতরে গেলেন। এবার কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সাথে তার বেতন-ভাতা নিয়ে দর-কষাকষি–

হোজ্জা: অসুস্থ হলে প্রথম শ্রেণির হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করার সব খরচ দেবেন তো?

পরিচালক: না, কেবল মাসিক মেডিকেল অ্যালাউন্স বেতনের সাথে যাবে।

হোজ্জা: প্রাপ্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা? আগে ছুটি ছিল দেড় মাসের আর ভাতা তিন মাসের বেতন।

পরিচালক: দুঃখিত আমাদের সে সুযোগ নেই। প্রতি তিন বছরে একবার দুই সপ্তাহের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মিলবে।

হোজ্জা: বার্ষিক বোনাস তিনটি তো?

পরিচালক: কোম্পানি লাভ করতে পারলেই কেবল একটি বোনাস পাবে।

হোজ্জা: আগের কোম্পানি বৈশাখে ইলিশ-মিষ্টি আর ক্রিসমাসে উপহার পাঠিয়ে দিত। বছরে একটা ফরেন ট্যুর।

পরিচালক: তাহলে এত ভালো কোম্পানি ছেড়ে আপনি এখানে কেন আসতে চাচ্ছেন?

হোজ্জা: কী করব বলুন। এত বেশি বেশি দিতে দিতে কোম্পানি লাটে উঠেছে, এখন দেউলিয়া। তাই আপনাদের কথা মনে পড়ল।

ম্যানেজার হোজ্জা

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার পড়াশোনা আর ভাল্লাগছে না। ঠিক করলেন চাকরি করবেন। ম্যানেজার পদে। প্রথম ইন্টারভিউতেই বোর্ড তার জবাবে মুগ্ধ। তাকে অনুরোধ করা হলো, কালই জয়েন করুন।

> কাজ শুরু করলে ছুটি পাওয়া মুশকিল হবে। আমাকে শুরুতেই ছয় মাসের ছুটি মঞ্জুর করুন। ছয় মাস পরেই বরং ৩০ হাজার টাকা বেতনে জয়েন করি, কী বলেন?

১৯০৬ সালে প্রকাশিত মোল্লা নাসরাদ্দিন বইয়ের প্রচ্ছদ।

হোজ্জা বেতনের ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে চাইছিলেন।

ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, প্রথম ছয় মাস কুড়ি হাজার। এ সময় কোনো ভাতা নেই। ছয় মাস পেরোলেই বেতন ৩০ হাজার, বেতনের অর্ধেক বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা। কেমন মনে হচ্ছে?

হোজ্জা বললেন, বেশ।

তাহলে কালই জয়েন করুন।

হোজ্জা বললেন, কাজ শুরু করলে ছুটি পাওয়া মুশকিল হবে। আমাকে শুরুতেই ছয় মাসের ছুটি মঞ্জুর করুন। ছয় মাস পরেই বরং ৩০ হাজার টাকা বেতনে জয়েন করি, কী বলেন?

একালের হোজ্জা

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা শেষ পর্যন্ত চাকরি নিলেন শহরের সবচেয়ে চালু একটি পিৎজার দোকানের ডেলিভারি বয় হিসেবে।

অল্প দিনের মধ্যেই সে এলাকার ধর্মগুরু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ দু-এক দিন পরপরই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য টিনের বাক্সে ৫০০ টাকা ফেলে কোনো কোনো নারী কনফেশন করছেন।

এরকম একজনের কনফেশন: ডেলিভারি বয়টা যখন পিৎজা নিয়ে এল, আমি বাড়িতে একাই ছিলাম। তারপর কী থেকে কী যে হয়ে গেল, আমি তার কথায় একেবারে অভিভূত হয়ে তার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তারপর ওই পাপ কাজটা করে ফেললাম। এ কথা বলেই নারী কাঁদতে শুরু করলেন।

ধর্মগুরু বললেন, কেঁদো না। তুমি যেহেতু তোমার অপরাধ বুঝতে পেরে কনফেশন করেছ এবং প্রায়শ্চিত্তের ফি দিয়েছ, তুমি ক্ষমা পেয়ে যাবে।

যিনিই আসেন ওই পিৎজা ডেলিভারি বয়টার সঙ্গে শুয়ে পড়ার কথা বলেন, অনুশোচনায় কাঁদতে থাকেন, ধর্মগুরু প্রবোধ দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

সবার কনফেশন থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে অপকর্মটি ওই পিৎজা ডেলিভারি বয় নাসিরুদ্দিন হোজ্জারই কাজ।

একদিন ধর্মগুরু দেখেন, ডেলিভারি বয় নিজেই তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বসে আছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হোজ্জা, তোমার আবার কিসের কনফেশন?

যা শুনেছেন সব সত্য।

তুমি তাহলে পাপকার্য থেকে বিরত থাকো।

হোজ্জা বললেন, তাহলে প্রায়শ্চিত্তের টাকা পাবেন কোথায়? এখন থেকে প্রায়শ্চিত্তের যে টাকা জমা হবে, তার অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।

তার মানে?

হোজ্জা বললেন, মানেটানে নেই। যদি দেন ভালো, না দিলে আমি এ শহর ছেড়ে পাশের শহরে চলে যাব, সেখানে পিৎজা ডেলিভারি বয়ের চাকরি আছে। সেখানে ফিফটি পার্সেন্ট কমিশনের গ্যারান্টি আছে।

ধর্মগুরু বললেন, আমিই দেব, থেকে যাও।

হোজ্জার ডায়িং শপ

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা ডায়িং শপ খুললেন। কাপড়ে রং করে দেন। ব্যবসা বেশ জমজমাট। একদিন শহরের মেয়র এলেন একটি কাপড় নিয়ে, রং করিয়ে স্ত্রীকে উপহার দেবেন। একই সঙ্গে হোজ্জাকে একটা শিক্ষাও দেবেন।

হোজ্জাকে বললেন, পাকা রং হতে হবে। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি, সবুজ আর কালো বাদ দিয়ে রং করাবেন। পারবেন তো?

অবশ্যই, এ আর তেমন কী?

তাহলে কবে নিতে আসব?

তুমি তো দেখছি বাপু আস্ত আহম্মক। এটাই ট্রেড সিক্রেট। বুঝতে পারোনি যে মাছটা ধরা পড়েছে। যাও, এখন থেকে রাস্তায় আর বিরক্ত কোরো না। মাছ ধরা পড়লে আর গায়ে জাল জড়িয়ে রাখতে নেই।

শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদ দিয়ে অন্য যেকোনো দিন নিয়ে যাবেন।

হোজ্জা যখন ছাত্র

১. হোজ্জা ক্লাস টিচারকে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার যে কাজ কেউ করেনি, সে জন্য কি তার শাস্তি পাওয়া উচিত? টিচার বললেন, অবশ্যই না।
হোজ্জা বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, তাই তো হওয়া উচিত। আমিও বাড়ির কাজ করিনি।
২. গণিত টিচার বললেন, হোজ্জা, তোমাকে যদি আজ তিনটা আর কাল তিনটা টেনিস বল দিই, তাহলে মোট কটা হবে?
হোজ্জা বললেন, নয়টা।
শিক্ষক চটে গিয়ে তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন।
হোজ্জা বললেন, আমার বাসার তিনটা বল আমি কাউকে দিয়ে দেব, এটা আপনি কেন মনে করলেন?
৩. স্কুল লাইব্রেরি থেকে নেওয়া 'হাউ টু বি আ মিলিয়নিয়ার' ফেরত দেয়ার সময় লাইব্রেরিয়ান দেখলেন অর্ধেক পাতাই নেই, তিনি হোজ্জার ওপর চটে গেলেন।
হোজ্জা বললেন, আপনার মতো একজন টিচারের জন্য কি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন যথেষ্ট নয়?

মাছটা যখন ধরা পড়েছে!

কাহিনিটা নাসিরুদ্দিন হোজ্জাকে নিয়েই। আদালতে বিচারপতি নিয়োগ করা হবে। সব মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। স্বভাব, চরিত্র, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং বিদ্যার দৌড় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সবচেয়ে উপযুক্ত লোকটিকেই বিচারপতি নিয়োগ করা হবে। আইনমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, অমবুডসম্যান, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক এবং ডিরেক্টর জেনারেল ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্সের সমন্বয়ে সাত সদস্যের একটি মিশন হেড-হান্টিংয়ে বেরিয়ে গেল। দেশের এক প্রান্ত থেকে শুরু করে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়িয়ে তিনজনের একটা শর্ট লিস্ট করা হলো। তিনজনের একজন হচ্ছেন হোজ্জা।

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং এবং হেড-হান্টিং কমিটি রাস্তায় নেমেছে শোনার পরপরই, পাছে তাকে কমিটির মুখোমুখি হতে হয়, এই আশঙ্কায় হোজ্জা বাড়ির সদর দরজায় বড় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন–'লজ্জাজনিত কারণে হোজ্জা কারও সঙ্গে দেখা করবেন না'। তারপর তহবন্দ, আচকান ও পাগড়ি ছেড়ে জালের মতো ফিনফিনে কাপড় গায়ে জড়িয়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি-বিষয়ক বইপত্রের মধ্যে ডুবে রইলেন। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে স্টক মার্কেটের খবর ও গরুর বাজারদরও জেনে নিচ্ছেন। দুই ব্যবসাতেই তার আয়ের একটা বড় অংশ লগ্নি করা।

হোজ্জাজির খবর মিশনের কাছে পৌঁছতে সময় লাগেনি। অনেকটা জোর করেই মিশনের সদস্যরা হোজ্জার কক্ষে পৌঁছালেন। পাতলা জালের মতো কাপড়ে মোড়ানো হোজ্জার দেহ তাদেরও লজ্জা দিল। একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে হোজ্জাজি বললেন, আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ছিলেন জেলে। সামান্য দেওয়ানি-ফৌজদারি শিখে আমার মধ্যে অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি পূর্বপুরুষের আত্মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে অভিজাত পোশাক ছেড়ে মূল পোশাক ধারণ করেছি।

মিশন রীতিমতো মুগ্ধ। তাদের আগমনে হোজ্জা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, মিশনের সকল সদস্যই ট্রেসপাসের অপরাধ করেছেন। হোজ্জার সম্মতির জন্য তারা অপেক্ষা করেননি। নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় আইনমন্ত্রী বললেন, হোজ্জাজি কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। কোদালকে কোদালই বলেন। আমরা যে ট্রেসপাসের অপরাধ করেছি, তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন। এমন লোকই আমরা চাই।

ভয় ছিল, হোজ্জা যদি বিচারপতি হতে গররাজি হন, তাহলে আবার অভিযানে বের হতে হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বললেন, তার চেয়ে দুজনের নাম ওয়েটিং লিস্টে রাখুন। হোজ্জাজি রাজি না হলে তাদের একজনকে নেওয়া যাবে।

মিশনের সুপারিশ সামারি আকারে রাজার কাছে গেলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে হোজ্জাকেই বিচারপতি হিসেবে অনুমোদন করলেন। হোজ্জাকে রাজি করানো আর এক সমস্যা। মুখ্য উজিরের 'নেতৃত্বে হোজ্জার সম্মতি গ্রহণ' কমিটি মাঠে নামল।

শেষ পর্যন্ত হোজ্জা সম্মত হলেন এবং যথাযথ পোশাক পরেই বিচারকার্য চালাতে লাগলেন।

আদালত থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে কজন বিনীত আইনজীবী তাকে কদমবুসি করে অত্যন্ত তাজিমের সঙ্গে বললেন, মিলর্ড একটা প্রশ্ন ছিল। ভয়ে না নির্ভয়ে করব?

নির্ভয়ে প্রশ্ন করো। বিচারপতি যদি তোমাকে অভয় না দেয়, তাহলে কে দেবে অভয়?

মিলর্ড, আপনি এখন আর মাছ ধরার জাল গায়ে জড়ান না কেন?

হোজ্জা বললেন, তুমি তো দেখছি বাপু আস্ত আহম্মক। এটাই ট্রেড সিক্রেট। বুঝতে পারোনি যে মাছটা ধরা পড়েছে। যাও, এখন থেকে রাস্তায় আর বিরক্ত কোরো না। মাছ ধরা পড়লে আর গায়ে জাল জড়িয়ে রাখতে নেই।

আইনজীবীরা মাথাটা প্রায় হোজ্জার হাঁটুর কাছে নামিয়ে এনে বললেন, মাচ অবলাইজড, মিলর্ড।

হোজ্জা বচন

সূর্যের চেয়ে চাঁদ বেশি উপকারী। কারণ, দিনের বেলা এমনিতেই আলো থাকে।

কলসি ভাঙার অপরাধে চড় মেরে কী লাভ, তার চেয়ে চড়টা আগাম মেরে দিলে সতর্ক থাকত।

দীর্ঘজীবী হতে হলে মাথা ঠান্ডা রাখুন আর পা গরম।

যখন বৃষ্টি হয়, পাকা রাস্তাও ভিজে যায়।

তুমি যা-ই করো, মানুষের জিব কখনো তোমাকে ছাড় দেবে না।

গাধার পিঠে উল্টো হয়ে বসলে অধিক মানুষের মুখোমুখি হওয়া যায়। ●

অলংকরণ: মাহতাব রশীদ

চিরনতুন মোল্লা নাসিরুদ্দিন কার?

ফারাহ জাহান শুচি

কালজয়ী, গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশুনন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে শুরু করে সাহিত্যকর্ম রচনার পাশাপাশি সাময়িকী প্রকাশ, নকশা, অঙ্কনেও সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছিলেন সমান পারদর্শিতা।

পাঠক ভাবতেই পারেন মোল্লা নাসিরুদ্দিনের প্রতি নিবেদিত লেখায় সত্যজিৎ কীভাবে প্রাসঙ্গিক। নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের কী সম্পর্ক! 'নাসিরুদ্দিন' চরিত্রটি সত্যজিতের সৃষ্টি নয়, সঠিক। তবে তাঁর মজার গল্পগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৭ সালের শারদীয়া 'সন্দেশ' (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের নাম শোনেননি, এ রকম লোক খুঁজে পাওয়া এখনও দুষ্কর। শৈশব থেকেই হোজ্জার গল্প শুনে বড় হয়েছে এখনও এমন মানুষ প্রচুর পাওয়া যাবে। তুর্কি এবং মধ্যপ্রাচ্যের লোককাহিনিতে মোল্লা নাসিরুদ্দিন বা নাসিরুদ্দিন হোজ্জাকে উপস্থাপন করা হয়েছে বিজ্ঞ এবং রসিকরাজ হিসেবে।

কিন্তু আসলে কি কিংবদন্তিতুল্য এই চরিত্র বাস্তবে ছিল? যদিও ধারণা করা হয়, ত্রয়োদশ শতকে আনাতোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ার কোথাও ছিল তাঁর বসতি। পেশায় হয়তো কাজি বা বিচারক ছিলেন।

তবে হাজারো কাহিনি, লোককথা গড়ে উঠেছে এই মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে ঘিরেই। প্রত্যুৎপন্নমতি নাসিরুদ্দিনের বিচার-বিশ্লেষণ তুখোড়; তাৎক্ষণিকভাবে যথোপযুক্ত জবাব দেওয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বি। সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেসব কথা আপাত সরস হলেও তার মধ্যে থাকে বার্তা।

গর্দভের পিঠে বসা মাথায় পাগড়ি পরিহিত নারুদ্দিনের চিরপরিচিত রূপ বংশপরম্পরায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী, নানান ধাঁচে, এই হোজ্জার গল্প বারংবার সংকলিত এবং প্রকাশিত হয়েছে।

একবার এক চাষা নাসিরুদ্দিনের কাছে এসে বলল, বাড়িতে চিঠি দিতে হবে মোল্লাসাহেব। মেহেরবানি করে আপনি যদি লিখে দেন।

নাসিরুদ্দিন মাথা নাড়লেন–সে হবে না।

কেন মোল্লাসাহেব?

আমার পায়ে জখম।

তাতে কী হলো মোল্লাসাহেব? চাষা অবাক হয়ে বলল, পায়ের সঙ্গে চিঠির কী?

নাসিরুদ্দিন বললেন, আমার হাতের লেখা কেউ পড়তে পারে না। তাই চিঠির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সে চিঠি পড়ে দিতে। জখম পায়ে সেটা হবে কী করে শুনি?

এই গল্পটি আমাদের অনেকেরই আগে শোনা হয়েছে। প্রশ্ন হলো: এই নাসিরুদ্দিন এই গল্প এখনও কেন প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি? মূলত এই আপাত বিনোদনধর্মী গল্পের পেছনে যে সামাজিক বার্তা এবং ফোকলোরের অমূল্য বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়, সে কারণেই টিকে থাকে। সব কলেই এ গল্প নতুন।

ভারতীয়-আফগান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক এবং পর্যটক তাহির শাহ, তিনি বিখ্যাত সুফি লেখক হোজ্জা সংলক ইদ্রিস শাহের ছেলে– তার মতে মোল্লা নাসিরুদ্দিন ছিলেন একই সাথে নির্বোধ এবং বিজ্ঞ: এ দুটিরই সংমিশ্রণ। উল্লেখ তার বাবা ইদ্রিস শাহ হোজ্জার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্প তিনটি সংকলনে প্রকাশ করে ইংরেজি পাঠকের কাছে হোজ্জাকে নতুন করে জনপ্রিয় করে তুলেন। সত্যজিতও এই ইদ্রিস শাহের সংকলনকেই অনুল্লেখপূর্বক হোজ্জার গল্পের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন মোল্লা নাসিরুদ্দিন রচনায়।

তাহির শাহের হোজ্জাকে নিয়ে লেখা একটি গ্রন্থ রয়েছে: 'ট্রাভেলস উইথ নাসিরুদ্দিন'। মুসলিম বিশ্বের এই চমকপ্রদ চরিত্রকে নিয়ে লেখা এ বইয়ে শাহের নিজস্ব যাত্রার কথাও উঠে এসেছে। তিনি ইংল্যান্ডের নটিং হিলের পোর্টোবেলোর এক বাড়িতেও নাসিরুদ্দিনের প্রতিকৃতি দেখতে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। তার ধারণা এটি হয়তো বুখারা থেকে আনা হয়েছিল।

রুশ চলচ্চিত্রের পূর্বসূরি ইয়াকভ প্রোটাজানভের এক ফুটেজ দেখে তার সূত্র ধরে শাহ চলে গিয়েছিলেন টোকিওর জিনবোচোতে। সেখানে তিনি 'কাশিকোইবাক্কা' নামের জাপানি বিদূষক ভাঁড়কে খুঁজে পেয়েছেন। যে আসলে হোজ্জার জাপানি সংস্করণ। মেক্সিকোয় শাহ হোজ্জাকে পেয়েছেন ইয়ুকাতানে 'বাবাক' নামে। মাথায় হেলমেটের পরিবর্তে কড়াই পরিহিত এই প্রিয় চিরনতুন এবং প্রাচীন বুদ্ধিমান ভাঁড়ের হাতে ওখানে দেখা যায় খঞ্জনী। আবার পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার একদল মুজাহিদের কাছে তিনি সেই নাসিরুদ্দিনের কথ কতা আবার শুনতে পান ভিন্ন আঙ্গিকে। তাদের মতে, নাসিরুদ্দিন নিজের বোকামিতে এতই পারঙ্গম যে তা যে কোনো জ্ঞানীর বুদ্ধিকেও হার মানিয়ে দেবে।

কাজেই মোল্লা নাসিরুদ্দিনের বিচরণক্ষেত্র এত বিশাল পরিসরে ছিল যে তার পরিচয় নিয়ে সুনিশ্চিত কোনো মন্তব্য করা কঠিন। উজবেকদের মতে, নাসিরুদ্দিন তাদেরই একজন। আজারবাইজানেও তাঁর নামে ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকা খুঁজে পাওয়া যায়। অটোমান সাম্রাজ্যের বুলগেরীয়দের মধ্যেও নাসিরুদ্দিন আছেন। আছেন হাঙ্গেরিতে। বেইজিং থেকে ঝিনজিয়াংয়ের উইঘুরবাসীর মধ্যেও আফেন্দির গল্প বহুল প্রচলিত। অন্যদিকে সমগ্র আরব বিশ্বে, মরক্কো থেকে পাকিস্তান হয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সর্বত্রই সুফি রচনায় এবং সাধারণ মানুষের গল্প-ঠাট্টায় হোজ্জা সকলের মধ্যমণি। এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতাতে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৯৬ সালে ইউনেসকো নাসিরুদ্দিনের ৭০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বছরটিকে আন্তর্জাতিকভাবে উদ্‌যাপন করেছিল। উল্লেখ্য, নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটি আনুমানিক।

মোল্লার বহু কূটকৌশল, হাস্যরস, বুদ্ধিমত্তা সবার– ধনীগরিব নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ তার গল্পে অনুরক্ত। তাদের জানা মোল্লা নাসুদ্দিন বা অন্য নামে পরিচিত ব্যক্তিটির গল্পে কখনো শব্দের খেলা চলে কিংবা কখনো অপ্রত্যাশিত কোনো মোড় থাকে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এসব মজার গল্প বহমান এখনও।

নাসিরুদ্দিন সাহিত্যে এখনো একই সাথে নির্বোধ এবং বুদ্ধিমান; পাপী এবং পুণ্যবান; সাধারণ এবং আধ্যাত্মিকতার মিশেলে গড়া এক চরিত্র। সময়ে হোজ্জা সমসাময়িক হয়ে উঠছে। হোজ্জা আধুনিক গল্পে পিজ্জা বয়, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, স্টক ব্যবসায়ী।

অমীয় বইপুস্তকে নাসিরুদ্দিন নানা নমে হাজির আছেন। স্থানীয় চরিত্রের গল্পে মিশে গেছে হোজ্জার গল্প। বৌদ্ধিক সাহিত্যের দ্রুকপা কাগ্যুদের, যার বসতি ছিল তিব্বতে। আবার খ্রিষ্টধর্মে 'ফুলস ফর ক্রাইস্ট'-। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'নবরত্ন' সদস্য বীরবল কিংবা গোপাল ভাঁড়– আমাদের এসব চেনা চরিত্রের অনেক গল্পই নাসিরুদ্দিনেরও।

এ সময়ের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের চর্চা নাসিরুদ্দিনের মধ্যে অহরহ দেখি। নাসিরুদ্দিন প্রশ্ন করতেন, তাঁকে যে উত্তর দেওয়া হতো, তাতে তিনি সন্তুষ্টি না হলে, সেটিকে চ্যালেঞ্জ করতেন। প্রশ্ন করতে ভয় পেতেন না। তিনি বোকা প্রতিপন্ন হচ্ছেন কিনা থোরাই কেয়ার করতেন। তবে এসব অপ্রিয় প্রশ্নের জন্য নাসিরুদ্দিনকেও প্রায়ই নিন্দা-তিরস্কার কিংবা শাস্তির শিকারও হতে হয়েছে। কিন্তু সংকোচ-সংশয় না রাখার প্রচেষ্টাই তাঁর সবচেয়ে বড় পুরস্কার ছিল। ●

গ্রাফিক্স: ইজেল

বিংশ শতকের রাজনৈতিক ঠাট্টা-মশকরা

১৮ পৃষ্ঠার পর

হ্যাঁ, কার কথা?

কেন, এটা জিজ্ঞেস করার কী হলো, অবশ্যই হিটলার।

প্রশ্নকর্তার মুখে হাসি ফুটল, বললেন, ওহ তাই নাকি? বেশ আপনি মুক্ত এবং চলে যেতে পারেন।

সেই মানুষটি সেলের দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন এবং ফিরে এসে প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনার মনে কে আছে, বলুন তো!

'এই রুশকাহিনির একটি ইতালিয় ভার্সন রয়েছে'

একজন নারী রোমের একটি বাজারে এলেন। পাস্তা ও ফলের দোকানে বড় লাইন। রুটি নেই, পনির নেই, সাবান নেই।

তিনি চিৎকার করে বললেন, সবকিছু তার দোষ, এই বদমাশটার জন্য আজ এ অবস্থা। গোয়েন্দা পুলিশ তার দিকে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে, সিনোরা আপনি কার কথা বলছেন?

নারী আতঙ্কিত হলেও তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বললেন, কে আবার? আমার স্বামী।

গোয়েন্দা পুলিশ থ হয়ে গেল, তার শরীর বিবর্ণ। দ্রুত এই নারীকে স্যালুট দিয়ে পুলিশ বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি ডোনা র‍্যাচেল।

(ডোনা র‍্যাচেল বেনিত্তো মুসোলিনির স্ত্রী)

রেজা শাহ পাহলভি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ ইরানের সর্বময় ক্ষমতাধর বাদশাহ হিসেবে অভিষিক্ত হন। ইসলামি বিপ্লব ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তার জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৯১৯ তেহরানে, মৃত্যু নির্বাসিত জীবনে কায়রোতে ১৭ জুলাই ১৯৮০।

শ্রমিক অসন্তোষ ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে ইরানের শাহ কিছুটা বিব্রতকর অবস্থায় ছিলেন। অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখলেন নরম হাতের শাসনে তাদের নিরস্ত্র করা যাবে না। শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। আর সে জন্য দরকার কয়েক ডজন বাড়তি ট্যাঙ্ক।

ব্রিটেনের কভেন্ট্রিতে অস্ত্র কারখানা পরিদর্শনে এলেন। বড় খদ্দের পেয়ে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক লালগালিচা সংবর্ধনা দিয়ে শাহকে তার সম্মেলনকক্ষে নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রমিকদের লাঞ্চ টাইম শুরু হতে যাচ্ছে। লাঞ্চ টাইম হুটার বাজতে শুরু করল। আওয়াজে উৎকণ্ঠিত শাহ চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে এসে দেখলেন, হাতের হাতিয়ার রেখে হাজার হাজার শ্রমিক কারখানার বাইরে ছুটে যাচ্ছে। আতঙ্কিত শাহ বললেন, আমাদের এখনি পালাতে হবে। শ্রমিকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। চলুন তাড়াতাড়ি আপনাদের একটা ট্যাঙ্কে চড়ে দ্রুত কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যাই।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকে আশ্বস্ত করলেন, রয়াল হাইনেস, এখানে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এমনটা প্রতিদিনই ঘটে থাকে। আধঘণ্টার লাঞ্চ টাইম। সময় শেষ হলে আবার ঘণ্টা বাজতে থাকবে এবং শ্রমিকেরা দ্রুত এসে কারখানায় যার যার কাজে লেগে যাবে।

শাহ অবাক হয়ে বললেন, সত্যিই। তাহলে ট্যাঙ্ক কেনার দরকার নেই; তার বদলে আমি বরং নেব এক হাজার হুটার।

হিটলার কেবল ক্ষমতাসীন হয়েছেন। তার রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করার আগেই বহুসংখ্যক নাৎসিবিরোধী কৌতুক জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকগুলো হিটলারের নজরেও আসে। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং এসব কৌতুক রচনাকারীকে গ্রেপ্তার করে তার সামনে হাজির করার নির্দেশ জারি করেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নাৎসি পুলিশ কাউফম্যান নামক একজন ইহুদিকে ধরে তার সামনে হাজির করে।

হিটলার জিজ্ঞেস করেন, এই ইহুদি কী নাম তোমার?

–কাউফম্যান।

আমাকে এবং শূকরছানাকে জড়িয়ে যে কৌতুকটা বাজারে চালু আছে, সেটা কি তোমার তৈরি করা?

–জি ফুয়েরার, আমার।

যেদিন আমার মৃত্যু হবে, সেটাই হবে ইহুদিদের ছুটির দিন, এই কৌতুকটা কার?

–আমার।

আর এই কৌতুক– যেখানে নদীতে ডুবে মরা থেকে আমাকে একজন ইহুদি রক্ষা করে, আমি যখন তাকে পুরস্কার দিতে চাইলাম, সে বলল আমার জন্য সে কী করেছে, এটা কাউকে না বলাটাই হবে তার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

–জি, এটাও আমার।

হিটলার বললেন, ব্যাটা ইহুদি তোর কী দুঃসাহস! আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করছিস? আমাকে তুই জানিস–আমি কে? আমি থার্ড রাইখের প্রধান নেতা, যে রাজত্ব ১০০০ বছর টিকে থাকবে।

এবার কাউফম্যান বললেন, এক মিনিট দাঁড়ান। এই কৌতুকটার জন্য আমাকে দোষী করতে পারবেন না, এটা আমি আগে কখনো শুনিনি।

এই গল্পের একটি মিসরীয় ভার্সন রয়েছে

প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসেরকে নিয়ে প্রচারিত কিছু কৌতুক তার কানে এলে তিনি ক্ষিপ্ত হন এবং মূল কৌতুক রচয়িতাকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। এমনি একটি কৌতুকের সূত্র ধরে গোয়েন্দা পুলিশ এক বুড়ো মিসরীয় রম্য রচয়িতাকে গ্রেপ্তার করে নাসেরের সামনে হাজির করে।

নাসের বুড়োকে বললেন, এই বয়সে তুমি নিজের দেশ ও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ঠাট্টা-মশকরা করছ, তোমার লজ্জাশরম বলে কিছু নেই?

বুড়ো নিশ্চুপ।

নাসের বলতে থাকেন: অথচ আমি একটি সোনার দেশ তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, কৃষিতে সংস্কার এনেছি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করছি, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, আমার দেশের মানুষকে সুখী মানুষে পরিণত করছি...।

বুড়ো তাকে বাধা দিয়ে বলতে থাকে, ক্ষমা করবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, কসম, আপনি যে কৌতুকটা শোনাচ্ছেন, এটা আমার নয়।

এই কাহিনির একটি রুশ সংস্করণও আছে

সোভিয়েত রাষ্ট্র, সরকার ও ক্রুশ্চেভকে নিয়ে যারা কৌতুক ছড়াচ্ছেন, তাদের ওপর ক্রুশ্চেভ ক্ষুব্ধ। কী কুক্কুরি, এসব নোংরা কারা ছড়াচ্ছে। অন্তত একটাকে ধরে নিয়ে এসো।

কেজিবি এমন একজনকে ধরে ক্রুশ্চেভের সামনে হাজির করল। লোকটি মুগ্ধ হয়ে কক্ষের চারদিক দেখে বলল, বাহ বেশ তো, ভালো উন্নতি হয়েছে।

ক্রুশ্চেভ বললেন, এ আর এমন কী! আগামী কুড়ি বছরে কমিউনিজম সর্বত্র পৌঁছে যাবে এবং সবার অবস্থাই এমন হবে।

লেখক খুশিতে আহ্ করে উঠলেন এবং বললেন, আরও একটা কৌতুক পেলাম!

ইংলিশ, জার্মান না রুশ: কে বেশি সাহসী?

ইংলিশম্যান বলল, আমরাই, প্রতি দশজন ইংরেজের একজন নৌযুদ্ধে মারা যাচ্ছি।

জার্মান বলল, আমরা। প্রতি পাঁচজন জার্মানের একজন রণক্ষেত্রে মারা যাচ্ছি।

রাশান বলল, ধ্যাৎ, সবচেয়ে বেশি সাহসী আমরা। প্রতি দুজনের একজন কেজিবির ইনফর্মার, তবুও আমরা রাজনৈতিক জোক বলে যাচ্ছি।

নাসিরুদ্দিন?

যে নামেই ডাকো, হাসির ঝরনাধারা

সৈয়দ মুসা রেজা

'একই অঙ্গে এত রূপ'–মান্না দের বিখ্যাত এ গানের আগে কেউ অমন মনমাতানো সুর শুনেছেন কি না, জোর দিয়ে বলতে পারব না। একইভাবে একই ব্যক্তিত্বের অনেক নামের কথাও বোধহয় কমই জানি আমরা। এ রকম এক ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের অনেককালের পরিচিত, হাসি-বন্ধু, নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। নাসিরুদ্দিন হোক্কা, মোল্লা নাসিরুদ্দিন, নাসিরুদ্দিন খোজা, (দক্ষিণ এশিয়ায়) জুহা, নাসিরুদ্দিন এফেনদি কিংবা শুধু নাসিরুদ্দিন নাম নিলে বোঝানো হয় তাকেই। 'ভিনদেশী এক বীরবল' বলেও তাকে আখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান লেখক মোহাম্মদ নাসির আলী। তার অনূদিত হোজ্জার গল্প-সংকলনটির নামই 'ভিনদেশী এক বীরবল'।

গোলাপ যে নামেই ডাকো। তেমনি নাসিরুদ্দিন যে নামেই ডাকো, হাসির ঝরনাধারা, অনাবিল প্রবাহ। 'মিষ্টি হাসির দুষ্টামি' থেকে মশকরা, নির্মল রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এমনকি হো হো হাসি বা অট্টহাসিসহ হাসির সকল ধরনকেই পাওয়া যাবে তাকে নিয়ে গল্পগাথায়। এসব গল্পের কোনো কোনোটিতে দার্শনিক দৃষ্টির ছোঁয়াও মিলবে। কিংবা শিক্ষণীয় বিষয়ও থাকতে পারে তার কোনো কোনো গল্পে। আর যা-ই হোক, সবকিছুকেই ছাপিয়ে থাকবে হাসির তরঙ্গমালা। হোজ্জার গল্পমালা 'ইরান-তুরান পার হয়ে' বাংলাদেশেই কেবল আসেনি বরং হাল আমলের পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই হাসির ধ্রুপদি উৎস হয়েই বিরাজ করছে। অবশ্য আদিতে বলকান থেকে চীন পর্যন্ত লোককাহিনিতে হোজ্জাকেন্দ্রিক গল্পগুলোর দেখা মিলত।

হোজ্জার নামের সাথে তুরস্কের শহর আকসেহির নাম অবিচ্ছেদ্যভাবেই জড়িয়ে রয়েছে। তিনি ১৩ শতকে ছিলেন বলেও নানা সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা হয়। এই বিভিন্ন সূত্র বলেই নাসিরুদ্দিন হোজ্জাকে দার্শনিক, জ্ঞানী, আলেম (ধর্মবেত্তা), হাস্যরসের অধিকারী, সরস, তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের কাতারে ফেলা হয়। তাঁর গল্পগুলো বিশ্বের প্রায় সব জায়গায়ই শোনা যাবে। তুর্কিভাষী বিশ্বের উপজাতিদের মধ্যে থেকে পারস্য, আরব, আফ্রিকা এবং রেশম সড়ক বা সিল্ক রোড ধরে চীন এবং ভারত, পরে ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্যই, প্রায় সাত শ বছরে ধরে এসব গল্প হোজ্জার নামে চলছে। কিন্তু সব গল্পের সাথে হোজ্জার সম্পর্ক হয়তো নেই। শুধু তা-ই না, অধিকাংশ গল্প বিশুদ্ধ তুর্কিও নয়। বরং মুসলিম এবং এশীয় সংস্কৃতির অন্যান্য মানুষের সম্মিলিত মশকরা, ঠাট্টা বা হাস্যরস, বোকামি কিংবা আহাম্মকীর অমোঘ ফসল। এ কথা অনেকেরই মনে আছে যে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দকে ইউনেসকো 'নাসিরুদ্দিন হোজ্জা বছর' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। হোজ্জা যদি আজও বেঁচে থাকতেন, তবে তার বয়স হতো মাত্র ৮১৫-এর কাছাকাছি!

বীরবলের জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া গেলেও 'ভিনদেশী এই বীরবলের' জীবনের কথা সঠিকভাবে আজও জানা সম্ভব হয়নি। তার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে অনেক কথাই চালাচালি হয়। কিন্তু সন্দেহাতীত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। ইতিহাসের দিকে নজর রাখলে দেখা যাবে, ১৬ শতকের পর থেকে বিভিন্ন উৎস থেকে আসা জনপ্রিয় ঐতিহ্য, উপাখ্যান, কৌতুকগাথা, ঠাট্টা-মশকরাগুলোর স্ফটিকরণের সূত্র হয়ে সক্রিয় রয়েছে হোজ্জার নাম।

হোজ্জার নামে প্রচারিত গালগল্পের প্রথম দেখা মেলে ১৫ শতকের পুঁথি বা পাণ্ডুলিপিতে। ১৪৮০-এর এব'উল-খায়ের-ই রুমির 'সালতুক-নামে'তে প্রথম হোজ্জার নাম পাওয়া যায়। এই পুঁথির কাহিনিগুলো অনুসরণ করলে মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে দরবেশ রূপে দেখা যায়। আধুনিক তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমের আকসেহির শহরের সৈয়দ মাহমুদ হায়রানির অনুসারী ছিলেন হোজ্জা। হোজ্জাকেন্দ্রিক গল্প-কৌতুকের দেখা মিলবে তুর্কি ভাষায় লামি সিলবির (মৃত্যু ১৫৩১) গল্পের বই লেতা'ইফ'-এ। এতেও নাসিরুদ্দিন হোজ্জার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে কোনো ঐকমত্যের সুর পাওয়া যায় না। লামি সিলবি তার বইয়ে (১৪ শতকের ওসমানিয়া তুরস্কের কবি) সাইয়েদ হামজার সমসাময়িক হিসেবে তুলে ধরেন। দরবেশ মেহমুদ জিল্লি হিসেবে পরিচিত পরিব্রাজক এভলিয়া সেলেবির লেখায় নাসিরুদ্দিনের কথা এসেছে। ১৭ শতকে তিনি আকসেহিরে নাসিরুদ্দিনের সমাধিও পরিদর্শন করেন। তার রচনার ভিত্তিতে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন নাসিরুদ্দিন। তুর্কি ভাষা থেকে ইংরেজিতে হোজ্জার গল্পগুলো অনুবাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে লেভান্টে (লেভান্ট শব্দটি ইংরেজিতে ব্যবহার শুরু হয় ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। মূল অর্থ ছিল 'প্রাচ্য' বা 'ইতালির পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় ভূমি'। অনুমাননির্ভর এই ভৌগোলিক শব্দ দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি বিশাল এলাকাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ ইসরায়েল, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ফোরাতের মধ্যবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম তুর্কির গোটা অঞ্চল, এককথায় 'বৃহত্তর সিরিয়া'কে বোঝানো হয়।) ব্রিটিশ সাবেক কনসাল জেনারেল হেনরি ডি বার্নহাম, ডি এম জি। ১৯২৩-এ প্রথম প্রকাশিত বইটির নাম 'টেলস অব নাসের-ইড-দিন খোজা'। বইয়ের মুখবন্ধ থেকে জানতে পারি, ক্যামেরলোহার ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন হোজ্জার কাহিনি। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম

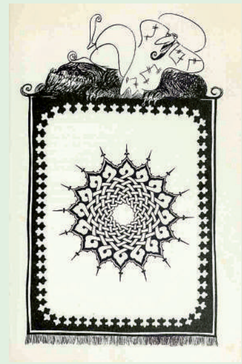

১৪ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর তার জন্ম তুরস্কের আঙ্গোরা জেলার সিবরিহিসারের স্থানীয় অধিবাসী বলেই মনে করা হয়। অল্প বয়সে তাকে কোনিয়ার হানাফি মজহাবের ধর্মীয় বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় পাঠানো হয়। এই মাদ্রাসায় সফলভাবে ফিকাহ শাস্ত্র পাঠ-সমাপ্তির বদৌলতে তিনি শিক্ষক বা ইমাম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি বিচারকের দায়িত্বও পালন করেছেন বলে দাবি করা হয়।

ইংরেজি ভাষায় হোজ্জার কাহিনি অনুবাদ করা হয়। জর্জ বরোর 'দ্য টার্কিশ জেস্টার, ওর দ্য প্লেজেনটারিস অব কজিয়া নাসের এদ্দিন এফেন্দি' নামের বইটি সীমিত আকারে, মাত্র দেড় শ বই, ছাপানো হয় সে সময়। স্বাভাবিকভাবেই সে বইয়ের রসাস্বাদন আম-ইংরেজি পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেদিক থেকে বার্নহামের বইকে বলা হয় হোজ্জা-কাহিনির প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি সংস্করণ। এতে আগ্রহী পাঠকদের জন্যই হোজ্জাকে তুলে ধরা হয়।

হোজ্জা বা খোজ্জা শব্দের অর্থ শিক্ষক। তার জন্ম বিষয়ক তুর্কি সূত্রের আরেকটি তথ্য: ১৪ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর তার জন্ম তুরস্কের আঙ্গোরা জেলার সিবরিহিসারের স্থানীয় অধিবাসী বলেই মনে করা হয়। অল্প বয়সে তাকে কোনিয়ার হানাফি মজহাবের ধর্মীয় বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় পাঠানো হয়। এই মাদ্রাসায় সফলভাবে ফিকাহ শাস্ত্র পাঠ-সমাপ্তির বদৌলতে তিনি শিক্ষক বা ইমাম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি বিচারকের দায়িত্বও পালন করেছেন বলে দাবি করা হয়। নাসিরুদ্দিন সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। তৎকালীন তুর্কি সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষাপটে এমন শ্রেণিবিন্যাস ভুল হবে না বলেই ধরে নেওয়া যায়।

পরবর্তী শতাব্দীতে সিবরিহিসারের মুফতি হুসেইন এফেন্দি (মৃত্যু ১৮৮০) মেকমুয়া-ই মাআরিফ বইতে লেখেন, ওই এলাকার হোর্তু গ্রামে ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন জন্ম নেন। পরে তিনি আকসেহির শহরে চলে আসেন এবং সেখানেই ১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। কোনিয়াতে তিনি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির সাথেও সাক্ষাৎ করেন। রুমির কাছ থেকে সুফিবাদ শিক্ষা নেন। তবে সাইয়্যেদ হায়রানিকে নিজ ধর্মগুরু বা শেইখ হিসেবে অনুসরণ করতেন বলে দাবি করা হয়। নাসিরুদ্দিন বিয়েও করেন আকেসেহির শহরে। রসিকতা এবং হাস্যরসে ভরপুরে হাজির জবাব ও চৌকস মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সেখানকার সমাজের উল্লেখযোগ্য সদস্য হয়ে ওঠেন হোজ্জা।

আলাদা আলাদা দুটো ওয়াকফ-নামাতে ১৩ শতকের মাঝামাঝি কোনিয়াতে নাসিরুদ্দিন ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়। এর একটি হলো ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সাইয়্যেদ মেহমুদ হারিয়ানির। অন্যটি হলো ১২৬৬ থেকে ৬৭ খ্রিষ্টাব্দের হাজ ইব্রাহিম সুলতানের।

কিন্তু তারপরও তাকে নিয়ে চলমান বিতর্কের এখনো হয়নি 'তামাম শোধ'। নিশ্চিত করে বলা যায়, ১৩ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আনাতোলিয়ায় ছিলেন নাসিরুদ্দিন। জন্ম হয়েছে হোর্তু গ্রামে। পরে তিনি সিবারিহিসার অঞ্চল ছেড়ে কোনিয়ার কাছাকাছি আকসেহিরে থিতু হন। সেখানেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এ শহরের রয়েছে তার মাজার। তার মাজার দেখতে গেলে চট করে ধাঁধায় পড়তে হবে। মাজারের সামনেই লোহার বিশাল ফটকে ঝুলছে অতিকায় তালা। না, ফিরে যেতে হবে না। মাজারকে ঘিরে কোনো প্রাচীর নেই। সরাসরি ঢোকা না গেলেও পাশ কাটিয়ে তার মাজারে ঢোকা যাবে। মুজতবা আলীর বর্ণনায় এ মাজারের কথা এসেছে। এর মধ্য দিয়ে হয়তো চূড়ান্ত রসিকতাও করে গেছেন হোজ্জা। জীবনটি ওই তালা দেওয়া বিশাল ফটকের মতোই। মৃত্যু আসবেই। ফটকের কোনো পাল্লা খোলার দরকার পড়বে না। পাশ কাটিয়েই ঢুকে আমাদের জীবনকে অনন্তের পথে নিয়ে যাবে!

নাসিরুদ্দিনের জীবন নিয়ে আরেকটি উল্লেখ রয়েছে: মাওলানা রুমির গোরস্তানে একটি সমাধিফলকে নাসিরুদ্দিনের কন্যা ফাতিমার নাম এবং পরিচয় উল্লেখ করা আছে। ফাতিমা পরলোকগমন করেন ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে। অনেকেই মনে করেন, ১৩ শতকে কোনিয়াতে নাসিরুদ্দিন বসবাস করতেন, তার আলামত হয়ে আছে এ সমাধিফলক।

অন্যদিকে তৈমুর লং বা খোড়া তৈমুরের দরবারের বিদূষক হয়েছিলেন নাসিরুদ্দিন। আবার ইমামতিও করতেন। কিন্তু চাটুকার ছিলেন না। 'টেলস অব নাসের-ইড-দিন খোজা' বইয়ের মুখবন্ধে হোজ্জার সাহসিকতার কাহিনি শোনান ব্রিটিশ সাংবাদিক, বিশিষ্ট লেখক, ইতিহাসবিদ এবং কূটনীতিবিদ স্যার ইগনাশিয়াস ভ্যালেন্টাইন চিরোল (২৮ মে ১৮৫২-২২ অক্টোবর ১৯২৯)। তৈমুর ব্যক্তিগত জীবনে সময়নিষ্ঠ নামাজি ছিলেন। আজান হলেই হোজ্জার ইমামতিতে নামাজ পড়তে দেরি করতেন না।

কথায় কথায়, কিয়ামতের দিনে তার বরাতে কী ঘটতে পারে, সে কথা হোজ্জার কাছে জানতে চান তৈমুর। হোজ্জা অসীম সাহসী জবাব দেন, মহামান্য সম্রাটের এ নিয়ে দুঃচিন্তার কোনো দরকারই নেই। চেঙ্গিস খান ও হালাকু সরাসরি জাহান্নামের সম্মানীয় আসনে বসে আছেন, সেখানেই সম্রাট তৈমুরের জন্যও নিঃসন্দেহে আসন সুনির্ধারিত হয়ে আছে।

চিরোল জানান, এমন জবাব দেওয়ার প্রায় পাঁচ শ বছর পর খলিফা আবদুল হামিদ পাশার সময় তুরস্কের রাজদরবার থেকে ব্রাত্য হতে হলো হোজ্জাকে। হোজ্জাকে নিয়ে সাহসী সব গল্প বলার মধ্য দিয়ে আকারে-ইঙ্গিতে তারই শাসনের প্রতি বিদ্রূপ করা হয় কি না, ভেবে এমন নিষেধাজ্ঞার ভারী জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া হয়। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে 'তরুণ তুর্কি'দের বিপ্লবের পর এ ব্রাত্য অবস্থার অবসান ঘটে।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার উপাখ্যানের প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপিতে গল্পসংখ্যা কম ছিল। আকারে ছোট ছিল। পরবর্তী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেসব পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে, সেগুলোর কলেবর বেড়েছে ক্রমাগত। উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য-এশিয়াটিক তুর্কি ভাষায় মুদ্রিত সংগ্রহগুলো বেশির ভাগই প্রথম তাতার ভাষায় প্রকাশিত পুঁথি থেকে নেওয়া। উসমানিয়ার তুর্কিদের সূত্র থেকে পাওয়া কাহিনিগুলো প্রায় অভিন্ন ছিল। ১৫ শতকের পর থেকে নাসরুদ্দিনের গল্পগুলো সংগ্রহের কাজের সূচনা হয়। প্রথম ছাপা হয় ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তাম্বুলের মাতবা-ই আমিরে (রয়্যাল প্রিন্টিং হাউস) লেতাইফ-ই হাসে নাসরুদ্দিন (খোজ্জা নাসরুদ্দিনের আনন্দদায়ক গল্প) শিরোনামে।

নাসিরুদ্দিনের প্রথম চিত্রটি আঁকা হয় ১৭ শতকের এক পাণ্ডুলিপিতে। পাণ্ডুলিপিটি দেখতে চাইলে আপনাকে তোপকাপি প্রাসাদ জাদুঘর গ্রন্থাগারে ঢুকতে হবে। মূলত এটি ক্ষুদ্রাকৃতি বা মিনিয়েচার চিত্রকর্ম। ছবিতে দেখতে পাবেন, মোল্লা নাসিরুদ্দিন বসে আছেন গাধার পিঠে।

তুর্কি ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে গোটা উসমানিয়া সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে নাসিরুদ্দিনের গালগপ্পগুলো। নাসিরুদ্দিনের সাথে যোগ হতে থাকে অন্যান্য চরিত্রের ঘটনাগুলোও। আরবি ও ফারসি লোককাহিনিতে সুপরিচিত হয়ে ওঠে নাসিরুদ্দিনের নাম। তার গল্পগুলো আলবেনীয়, আরবি, আজেরি, বাংলা, বসনীয়, হিন্দি, পশতু, ফারসি, সার্বিয়ান এবং উর্দু লোকজ ঐতিহ্যের অংশ হয়ে ওঠে। ক্রোয়েশীয় এবং ককেশীয় এমনকি চীনা ভাষায়ও একই নামে এসব গল্প পরিচিতি পায়। গোটা ইউরোপও জয় করে। 'হেলায় বিশ্ব করিল জয়'–ভিন্নতর প্রসঙ্গের কথাটি এখানে যথাযথ হয়ে উঠল।

২. মোল্লা নাসিরুদ্দিনের শিক্ষাজীবনের দুটি কাহিনি প্রথমেই তুলে ধরছি:

ওস্তাদের কথা শুনছে না শিশু নাসিরুদ্দিন। ঝিমুচ্ছে। ওস্তাদ দেখে রেগে গেলেন।–নাসির তোমার তো বাপু পড়ায় মন নেই। ঘুমিয়ে পড়েছ, না কেবল ঝিমুচ্ছ।

দ্রুতই জবাব এল–না ওস্তাদ। আমি জেগে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

*

অবিরাম কথক ছিল নাসিরুদ্দিন। ওস্তাদের কথায় কান না দিয়ে চলছে তার বকবকানি। ওস্তাদ খেপে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, নাসিরুদ্দিন তুমি আমার কথায় মনোযোগ দিচ্ছ না। এমন একদিন আসবে, মানুষ তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। তুমি একজন বিদূষক হবে। ভাঁড় বনবে। এমনকি তারা তোমাকে নিয়ে গালগপ্প করবে। একটি-দুটি নয়। সব সময় তোমাকে নিয়ে অন্তত সাতটি চাপা মারবে।

*

কম বয়স থেকেই গতরে খাটতে হয়েছে নাসিরুদ্দিনকে। কিশোর বয়সে এক গুদামে বস্তা টানার কাজও করেছে। সেখানে শ্রমিকেরা একবারে তিনটি করে বস্তা ঘাড়ে চাপিয়ে একটু দূরে জড়ো করে রাখছিল। কিন্তু নাসিরুদ্দিন অমন কাজের ধারেকাছেও গেল না। প্রতিবার সে বইতে থাকল মাত্র একটা করে বস্তা। বিষয়টা তদারকির দায়িত্ব থাকা ব্যক্তির শ্যেন নজর এড়াল না। একটা করে বস্তা নিচ্ছে এবং কাজে কেন ফাঁকি দিচ্ছে কর্কশ গলায় জানতে চাইল সে।

জবাব পেল, হুজুর ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। তিন বস্তা নিতে আমাকে তিনবার আসা-যাওয়া করতে হয়। ফাঁকিবাজের দল এই তিনবার আসা-যাওয়া করে গতর খাটাতে চায় না। তাই একবারে তিনটা করে ছালা ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে।

*

তুরস্কে হোজ্জার ভাস্কর্য।

শহরের মধ্যে প্রধান চত্বর দিয়ে নাসিরুদ্দিন গাধায় করে চলছে। সাথে রয়েছে তার বন্ধু। হঠাৎ দুষ্ট বুদ্ধি ঝিলিক দিল নাসিরের মাথায়। বন্ধুকে বলল। মজা করার জন্য তারা দুজনে মিলে চিৎকার জুড়ল, সোনা! সোনা!! সোনা!!! পাশের জঙ্গলে সোনা পেয়েছি।

আর যায় কোথায়। অমনি সব মানুষ দে ছুট। প্রাণপণে দৌড় দিল জঙ্গলের দিকে। মূর্হূতেই শহর ফাঁকা। এবারে দেখা গেল হোজ্জাও তার গাধাকে তাড়িয়ে নিয়ে প্রায় জান বাজি রেখে ছোটাচ্ছে! বন্ধু বেকুব বনে গেল। 'আরে হোজ্জা করছ কী? পাগল হলে নাকি?'

হোজ্জার জবাব শোনার জন্য বন্ধুকে তাল রেখে তাকেও ছোটাতে হচ্ছে গাধা। ছুটন্ত হোজ্জা বলল, দেখো সব মানুষ সোনার খোঁজে জঙ্গলে গেছে। হয়তো সোনা থাকতে পারে। তা-ই ছুটছি।

–আরে বাবা তুমি না মজা করলা।

–হ্যাঁ, তা করেছি। কিন্তু এত মানুষ যখন কথাটা বিশ্বাস করল, তখন হয়তো সত্যি সত্যিই সোনা থাকতে পারে। বলতে বলতে গাধার গতি বাড়ানোর জন্য আরও চেষ্টা করতে লাগল হোজ্জা। চিৎকার করে বলতে লাগল, সোনা! সোনা!! সোনা!!! আছে জঙ্গলে!

*

রাস্তার পাশে নাসিরুদ্দিন একটা দোকান দিয়েছে। বড় বড় করে লেখা–'যেকোনো বিষয়ে দুটো প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে। এ জন্য দিতে হবে এক হাজার টাকা। প্রশ্ন করার আগে টাকা জমা দিতে হবে।' একজন দুটো প্রশ্ন ঠিক করে এল নাসিরুদ্দিনের দোকানে। এক হাজার টাকা আগে দিল। তারপর বলল, ভাই দামটা চড়া একটু কমানো যায় কি?

–না। গম্ভীরভাবে জবাব দিল। তারপর টাকা ক্যাশবাক্সে রাখতে রাখতে বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলো তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কী?'

*

লাশের খাট নিয়ে যাওয়ার সময় কোথায় দাঁড়ানো ঠিক হবে? সামনে, পেছনে, ডাইনে না বায়ে–একজন নাসিরুদ্দিনের কাছে জানতে চাইল। জবাব পেল, 'সামনে-পিছে, ডান-বাম কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেবল খেয়াল রেখো, তুমি শুধু খাটের ওপর শোয়া থেকো না!'

*

গাধা হারিয়ে গেছে, তারপরও বেশ খোশ মেজাজে রয়েছে নাসিরুদ্দিন। এক বন্ধু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল–গাধা হারানোর পরও এত ফুর্তিতে কেন তুমি?

–বড় বালা থেকে বাঁচলাম কি না, তা-ই।

–মানে?

–সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না, তাহলে শোনো, ভাগ্যিস গাধার পিঠে আমি ছিলাম না। নইলে তো আমিসহই হারিয়ে যেতাম। জবাব দিল হোজ্জা।

*

শহরে নতুন বিচারক দরকার। শহর পরিষদের সদস্যরা যোগ্য লোকের খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। সে সময় দেখা গেল, জাল কাঁধে বিনীত ভঙ্গিতে যাচ্ছেন নাসিরুদ্দিন। সদস্যরা অবাক হলো। জাল কাঁধে কেন ঘুরছে নাসিরুদ্দিন? জানতে চাইল। জবাবে নাসিরুদ্দিন বলল, আমি গরিব মানুষের কাতার থেকে উঠে এসেছি। সে কথা মনে রাখার জন্য এই জাল নিয়ে ঘুরছি।

এমন বিনয়ী মানুষই ভালো বিচারক হবে–ভাবল সদস্যরা। নাসিরুদ্দিন শহরের বিচারক হলো। বছরখানেক পর পরিষদ সদস্যরা নাসিরুদ্দিনকে দেখতে গেল। এবারে তার কাঁধে কোনো জাল নেই।

–বাহ! জাল নেই কেন? অবাক হয়ে জানতে চাইল তারা।

–বাহ! জাল থাকবে কেন? মাছ ধরার পর জালের আর দরকার আছে কি? পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিল নাসিরুদ্দিন।

*

নাসিরুদ্দিন তার বেগমকে সোহাগ করে নানা নামে ডাকত।

আমার হিরের টুকরা।
আমার কলিজ।
আমার জান।
আমার আত্মা
ইত্যাদি, ইত্যাদি।
তবে বেশির ভাগ সময়ই বলত,
আমার প্রাণ।

একরাতে নাসিরুদ্দিন স্বপ্নে দেখে আজরাইল এসেছে।

হোজ্জাকে বলছে, তোমার প্রাণ নিতে এসেছি।

নাসিরুদ্দিন তার পাশে ঘুমে অচেতন বেগমকে দেখিয়ে বলল,

–ওই যে আমার প্রাণ। ঘুমাচ্ছে। তাকে কি ডেকে তুলব?

*

নিজের কবর পাকা করাচ্ছে মোল্লা নাসিরুদ্দিন। এখানে এ কাজ করো, সেখানে সে কাজটি করো। এভাবে খুঁটিনাটি নিদের্শ দিচ্ছে। আর রাজমিস্ত্রি দ্রুত তা করছে। কাজ শেষে নাসিরুদ্দিনের কাছে এসে দাঁড়াল।

–সারা দিন খাটছি, এখন মজুরিটা দিয়ে দিলে চলে যেতে পারি।

–কাজ শেষ না হলে মজুরি দিই কি করে?

রাজমিস্ত্রি অবাক হলে বলল–আর কোন কাজ বাকি?

–আরে বাবা, আসল কাজই তো বাকি। লাশ ছাড়া কবর হয় নাকি। কবরের মধ্যে লাশ কই যে তোমাকে মজুরি দেব!

*

বলা হয়, নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কবরফলকে দুটো বাক্যই খালি লেখা আছে,

চলতে থাকো।
চলাই ভালো।

অকৃতজ্ঞ গাধারা সুলতান হয়ে থাকে

আন্দালিব রাশদী

নাসিরুদ্দিন হোজ্জাকে পৃথিবীর অনেক দেশ সে দেশের সন্তান বলে দাবি করে, তার জন্মোৎসব পালন করে, তাকে নিয়ে সাংবাৎসরিক মেলা বসায়। হোজ্জার দাবিদারদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে তুরস্ক। তাদের দাবি, ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তুরস্কের আকসেহির প্রদেশে তার জন্ম আর ১২৭৫ কিংবা ১২৮৫ সালে তার মৃত্যু হয়। সেখানে তার সমাধিও আছে। এই সমাধি ঘিরে প্রতিবছর ৫ থেকে ১০ জুলাই আন্তর্জাতিক নাসিরুদ্দিন হোজ্জা উৎসব চলে।

হোজ্জাকে নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন অধ্যাপক মিকাইল ব্যায়রাম। তিনি মনে করেন, নাসিরুদ্দিন হোজ্জার জন্ম পশ্চিম আজারবাইজান খয় শহরে। তার পুরো নাম নাসির উদ-দিন মাহমুদ আল-খোয়ি, বংশনাম আহি এভরান। তিনি পড়াশোনা করেছেন খোরাসান শহরে। হেরাতে বিখ্যাত কুরআনে মুফাসসির ফকর আল-দিন আল-রাজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার অধীনে পড়াশোনা করেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে লোকবল সংগঠিত করার জন্য বাগদাদের খলিফা তাকে তুরস্কের আনাতোলিয়ায় পাঠান।

তিনি ক্যায়সিরির কাজি নিযুক্ত হয়ে বিচারাসনে বসেন। তিনি রাজনৈতিকভাবে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠেন। মসনবিতে তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

দ্বিতীয় কায়কাউসের দরবারে তাকে উজির নিয়োগ করা হয়।

মোঙ্গল আক্রমণের বিরোধিতা তাকে বিশেষ খ্যাতিমান করে তোলে। বহু শহরে বসবাস, বহু ক্ষমতাসীন ব্যক্তির সঙ্গে চেনাজানা এবং তার অসাধারণ রসবোধের জন্য হোজ্জাকে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি আপন করে নেয়। তুরস্ক থেকে আরব ভূখণ্ড, পারস্য থেকে আফগানিস্তান, রাশিয়া থেকে চীন তিনি সর্বত্রই আদৃত হন।

নাসিরুদ্দিনের নামের সঙ্গে মোল্লা, খোজা, আফেন্দি, হোজ্জা অনেক কিছু যোগ হয়েছে। হোজ্জার রস-কাহিনি কিছু লিখিত হয়েছে, কিছু লোককথার মতো মুখে মুখে ছড়িয়েছে। হোজ্জার রস-রচনার প্রাচীনতম আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিটি ১৫৭১ সালের।

বিচারব্যবস্থা, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে অনেক ঠাট্টা-মশকরা করার পরও হোজ্জা মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। কখনো পণ্ডিত, কখনো বোকা, কখনো খামখেয়ালি চরিত্র হিসেবে হোজ্জা ফার্সি, আরবি, উর্দু, আফগানি, আলবেনীয়, আর্মেনীয়, বাংলা, বসনীয়, বুলগেরীয়, গুজরাটি, হিন্দি, কুর্দিশ, রুশ ও চৈনিক সংস্কৃতির একান্ত আপনজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

তার খামখেয়ালিপনা মূলত হোজ্জার দার্শনিকী আত্মপ্রকাশ। ইউনেসকো ১৯৯৬-৯৭ সালকে আন্তর্জাতিক নাসিরুদ্দিন বর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপন করেছে।

হোজ্জার অনেক গল্প আফ্রিকার সোয়াহিলি ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় আবু নওয়াসের গল্প হিসেবে পরিচিত। তার প্রভাব ইউরোপেও পড়েছে। তার গল্প ঈশপের গল্প হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন বাবা-ছেলে ও তাদের গাধার গল্পটি। মোল্লা নাসিরুদ্দিন নামের একটি বিখ্যাত ম্যাগাজিন সারা পৃথিবীতে পরিচিত।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটি মাদী গাধা ছিল। সেই গাধা একটি বাচ্চা প্রসব করল। হোজ্জা মনে করলেন, তিনিই বাচ্চাটির বাবা। তিনি এখন তাহলে দুটো গাধার মালিক। ঠিক করলেন, ছোটটাকে স্কুল মাস্টারের কাছে পাঠিয়ে পড়াশোনা করাবেন। ভালোভাবে শিক্ষিত হবে, পড়তে পারবে এবং ভবিষ্যতে হোজ্জাকেও শেখাতে পারবে।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা বাচ্চা গাধাকে হালিল নামক একজন স্কুল শিক্ষকের কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এটা আমার ছেলে, আমি চাই সে শিক্ষিত হোক। কেবল তাহলেই সে আমার চেয়ে কম বোকামি করবে। শুনেছি, তোমরা গাধা পিঠিয়ে মানুষ করার সুনাম আছে। দরকার হলে আমারটাকেও দু-ঘা মেরে দেবে।

হালিল অবাক হয়ে বললেন, কী বলতে চাইছ হোজ্জা? গাধার বাচ্চাকে পড়াতে হবে?

নাসিরুদ্দিন মাথা নেড়ে বললেন, সমস্যা কোথায়? আমি উপযুক্ত টিউশন ফি দেব, বাচ্চাটার থাকার জায়গার ভাড়া দেব, খোরাকির টাকাও দেব।

হালিল বললেন, বেশ তাহলে গাধার বাচ্চাটাকে আমার ছাত্র হিসেবে ভর্তি করে নেব আর সিলেবাস অনুযায়ী সবই পড়াব।

কিন্তু হালিল টিউশন, লজিং ও খোরাকি বাবদ মোটা টাকা আবদার করে দড়ি ধরে গাধার বাচ্চাটাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলেন এবং আশ্বস্ত করলেন, হোজ্জা বাড়ি ফিরে যাও, শান্তিতে ঘুমাও। গাধার বাচ্চাটাকে আমি নিজের সন্তান বিবেচনা করে পড়াব।

আশ্বাস পেয়ে হোজ্জা চলে গেলেন। হালিল স্ত্রীকে ডেকে বললেন, শুনে যাও, ওই নাসিরুদ্দিন হোজ্জা আসলেই একটা গাধার বাচ্চা গাধা। এমন আহাম্মক আমি কখনো দেখিনি। সবাই জানে গাধার বাচ্চাকে গাধার বাচ্চা হওয়া ছাড়া আর কিছু শেখানো যায় না।

পরদিন হালিল হোজ্জার পুত্র এই গাধার বাচ্চাটাকে বাজারে নিয়ে গেলেন এবং ভালো দাম পেয়ে বিক্রি করে দিলেন।

সপ্তাহ গেল, আরও তিন দিন কাটার পর নাসিরুদ্দিন হালিলের বাড়িতে হাজির হয়ে তার পুত্রের খোঁজ করলেন কিন্তু কোথাও দেখলেন না। একপর্যায়ে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, মাস্টার, তোমার ছাত্র কোথায়? শিক্ষক বললেন, এখানে নেই তো। অন্য ছাত্রদের সাথে আমি তাকে দূরের একটি পাঠাগারে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, তার পড়াশোনায় অগ্রগতি ভালো হচ্ছে, অন্য ছাত্ররা তাকে বেশ পছন্দ করছে।

হোজ্জা বললেন, শুনে ভালো লাগল। আমি ভয়ে ছিলাম, সে না আবার তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তার মা তো আমাকে জ্বালিয়ে মারল। ঠিক আছে ১০ দিন পর এসে দেখে যাব।

হালিল বললেন, নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যাও। তোমাকে দেখার জন্য ছেলের মন অস্থির হয়ে উঠেছে–এমন কিছু তো আমাকে বলেনি। নিশ্চিত থেকো সে ভালো শিক্ষকের হাতেই পড়েছে।

নাসিরুদ্দিন এ কথা শুনে সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরল। ১০ দিন পর আবার ফিরে এসে গাধার বাচ্চাটাকে কোথায় দেখতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, আমার ছেলে কোথায়?

হালিল নাসিরুদ্দিন হোজ্জাকে অভিনন্দন জানিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন, তার সন্তান ক্লাসের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রমাণিত হয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেছে।

পরিশ্রমী এবং পড়ুয়া ছেলের কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হলেও ছেলেকে না দেখে ফিরতে হোজ্জার মন চাইল না। এত দিন হয়ে গেল ছেলেও বাবাকে দেখেনি, নিশ্চয়ই তার মনেও অস্থিরতা রয়েছে। তা ছাড়া ছেলেকে না দেখে ফিরলে তার মাকেই বা কী বলবেন?

হালিল বললেন, তোমার জানার কথা নয় যে তোমার ছেলে একই সঙ্গে আইন বিষয়ে দক্ষ পরামর্শদাতায় পরিণত হয়েছে। তার পরামর্শ গ্রহণের জন্য সরকার এখন তার সঙ্গে বৈঠক করছে। সময়টা তার জন্য খুব মূল্যবান। তুমি বরং ফিরে যাও। তুমি যে এসেছিলে, চিঠি লিখে আমি তোমার ছেলেকে জানিয়ে দিচ্ছি এবং তার ফেরার তারিখ নিশ্চিত হলে চিঠি লিখে তোমাকেও জানিয়ে দেব। তার মাকেও দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ কোরো।

তারপর অনেক দিন গেল শিক্ষকের চিঠি পাবার প্রতীক্ষায়। না পেয়ে অস্থির হয়ে হোজ্জা হাজির হলেন। হালিল বললেন, একদম ঠিক সময়ে হাজির হয়েছ। আমি কেবলই তোমার ছেলের চিঠি পেয়েছি। অনেক ভালো খবর আছে।

হোজ্জা জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখেছে আমার ছেলে?

হালিল বললেন, যা লিখেছে আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু আমি জানি সে এক অসাধারণ ছাত্র। তার পক্ষেই এটা সম্ভব।

হোজ্জা বললেন, সত্যি বলছ? আমাকে পড়ে শোনাও।

হালিল বললেন, গত সপ্তাহে তোমার ছেলে রাজধানীতে যায়। সেখানে তাকে সুলতান নিয়োগ করা হয়েছে।

হোজ্জা বললেন, তাহলে আমি আজই তার সাথে দেখা করতে রাজধানী রওনা হচ্ছি।

হালিল বললেন, সমস্যা নেই, যেত পারো। কিন্তু সেখানে পৌঁছে বলতে যেয়ো না যে তুমি তার বাবা। কারণ, সে সুলতান। যদি তার মন-মেজাজ ভালো না থাকে, হয়তো তোমাকে ধরে চাবকাতেও পারে। আর একটা কথা মনে রেখো, গাধার বাচ্চারা অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

হোজ্জা বললেন, আমি চাবুকের ভয়ে ভীত নই।

যথারীতি হোজ্জা রাজধানীতে সুলতানের দরবারে পৌঁছলেন। দরবারে তখন বৈঠক চলছিল। হোজ্জা একদিক দিয়ে ঢুকে বললেন, আরে দেখছি গাধার বাচ্চাটা বেশ মানুষ হয়েছে। মাস্টার তাহলে ভালোই পড়িয়েছে। এটা তো আসলে আমার সন্তান।

হোজ্জা দরবারের বিভিন্ন অংশে গিয়ে জোরেশোরে এসব কথা বলার পর সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গ্রেপ্তার করার এবং বেঁধে চাবকানোর আদেশ দিলেন।

যখন তাকে চাবকানো হচ্ছিল, তিনি বললেন, বাস্তবিকই গাধার বাচ্চাগুলো ক্ষমতায় গেলে অকৃতজ্ঞই হয়ে থাকে। এই গাধার বাচ্চাটার পেছনে কত টাকা খরচ করে মাস্টারকে দিয়ে পড়িয়ে মানুষ বানিয়েছি। তার বদলে গাধার বাচ্চা আমার সাথে এই আচরণ করছে।

সুলতান আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তাকে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দাও। উজির বললেন, হোজ্জার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নতুবা এসব কথা কেউ বলে। তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে বরং শহর থেকে বের করে দিন।

সে যাত্রায় নাসিরুদ্দিন হোজ্জা বেঁচে গেলেও ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে মা-গাধাটার লেজ কেটে ফেললেন। অপদস্ত হোজ্জা তার অভিজ্ঞতার সারাংশ উপস্থাপন করলেন: অকৃতজ্ঞ গাধার বাচ্চারাই সুলতান হয়ে ক্ষমতাসীন হন।

হোজ্জার চাঁদ উদ্ধার

কূপ থেকে পানি তুলতে গিয়ে দড়িবাঁধা বালতি নামাতেই হোজ্জার চোখে পড়ল পানিতে চাদের প্রতিবিম্ব। হোজ্জা ভাবলেন এটা চাঁদই।

সুতরাং, বিপদাপন্ন চাঁদকে উঠিয়ে আনার কসরত শুরু করলেন। পুরু দড়িতে আংটা বেঁধে কূপের ভেতর ছেড়ে দিলেন। দড়ি নিচে নেমে এল এবং আংটা কয়েকবার চাঁদকে স্পর্শ করল। হঠাৎ আংটাতে একটা ভারী পাথর আটকে গেল। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে তিনি টানতে থাকলেন। একপর্যায়ে দড়ি ছিড়ে গেল এবং তিনি কূপের কাছেই ছিটকে পড়লেন, ব্যথাও পেলেন। কিন্তু তখুনি তার চোখ পড়ল আকাশে, চাঁদটা জ্বলজ্বল করছে। তিনি স্বগোতোক্তি করলেন, যাক, আমি ব্যথা পেয়েছি তাতে কিছু এসে-যায় না, চাঁদটাকে তো কূপ থেকে তুলতে পেরেছি। আমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি।

টাকাপয়সার নিরাপত্তা

হোজ্জা টাকাপয়সার নিরাপত্তা নিয়ে খুব ভাবেন। একটার পর একটা ব্যাংক বসে যাওয়ার পর হাতের টাকা গর্তে লুকিয়ে রাখতে শুরু করেছেন। একবার কিছু টাকা এলে একটি গর্ত খুঁড়ে একটি ব্যাগে ভরে টাকাটা লুকিয়ে ফেললেন। গর্তের ওপর সবুজ ঘাস লাগিয়ে দিলেন। কদিন পর তার মনে হলো, জায়গাটা নিরাপদ নয়, কেউ খুঁজে বের করে ফেলতে পারে। তিনি ভিন্ন একটি গর্ত খুঁড়ে টাকা লুকোলেন। এ রকম বেশ কবার গর্ত বদল করার পর তার মাথায় অধিকতর নিরাপদ একটি আইডিয়া এল। তিনি গাধার পিঠে চড়ে, একটি পাহাড়ে উঠে একটি বাঁশের ডগায় টাকার ব্যাগটি ঝুলিয়ে ভূমি সমান্তরাল করে বাঁশটি গেঁথে রাখলেন। মানুষ তো আর পাখি নয় যে বাঁশের ডগায় ঝোলানো ব্যাগ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। কিন্তু শুরু থেকে একজন হোজ্জাকে অনুসরণ করছিলেন। তিনি বাঁশটা মাটি থেকে তুলে, বাঁশের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে ভেতরে উটের গোবর ঢুকিয়ে আবার আগের মতো বাঁশ পুতে রাখলেন। অনেক দিন পর টাকার প্রয়োজন হলে হোজ্জা বাঁশ টেনে দেখলেন–ভেতরে টাকা নেই, আছে কেবল উটের গোবর।

তিনি অবাক হলেন। যেখানে মানুষের যাবার সাধ্য নেই, উট সেখানে পৌঁছে কাজটা করল কেমন করে?

হোজ্জার মৃত্যুসংবাদ

শহরের বাইরের বৃত্তাকার সড়ক ধরে নাসিরুদ্দিন হোজ্জা হাঁটছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। একটু বিশ্রাম না হলে আর চলার শক্তি ফিরে পাবেন না–এমনই অবস্থা। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত একটি অনুভূতি হলো। তিনি নিজেকেই শোনালেন, বুঝতে পেরেছি, আর সময় নেই, আমি নিশ্চয় মরে গেছি। আর দেরি না করে মাথাটা মক্কামুখী করে তিনি ভূমিশয্যা নিলেন। দীর্ঘ সময় এ অবস্থায় পড়ে রইলেন। কিন্তু তার এই পুরো সময়টায়, তার পাশ দিয়ে একজন মানুষও অতিক্রম করল না। এতে হোজ্জা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, আমি মরে গিয়ে শহরের বাইরের রাস্তায় পড়ে ছিলাম, একটা লোকও আমার লাশটা তুলে আনল না।

খবরটা স্ত্রীকে দিয়েই তিনি তাড়াতাড়ি আবার আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে মক্কামুখী মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

দুঃসংবাদটি জানার পর হোজ্জার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে ফেললেন। কান্নার শব্দে প্রতিবেশী ও পরিচিতজন ঘটনা জানার জন্য তার বাড়িতে গেলেন। খোঁজ নিয়ে হোজ্জার স্ত্রীর কাছ থেকেই তার মৃত্যুসংবাদ পেলেন এবং তারাও ব্যথিত হলেন।

একজন প্রতিবেশী জানতে চাইলেন, নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুসংবাদটি পেলে কেমন করে?

তার স্ত্রী বললেন, বেচারা কী আর করবে, মৃত্যুসংবাদটা পাঠানোর মতো একজন কাউকেও না পেয়ে নিজেই এসে সংবাদটা দিয়ে আগের জায়গায় চলে গেছে। ●

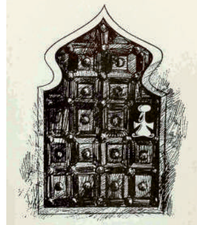

হোজ্জা টাকাপয়সার নিরাপত্তা নিয়ে খুব ভাবেন। একটার পর একটা ব্যাংক বসে যাওয়ার পর হাতের টাকা গর্তে লুকিয়ে রাখতে শুরু করেছেন। একবার কিছু টাকা এলে একটি গর্ত খুঁড়ে একটি ব্যাগে ভরে টাকাটা লুকিয়ে ফেললেন। গর্তের ওপর সবুজ ঘাস লাগিয়ে দিলেন। কদিন পর তার মনে হলো, জায়গাটা নিরাপদ নয়, কেউ খুঁজে বের করে ফেলতে পারে। তিনি ভিন্ন একটি গর্ত খুঁড়ে একটি ব্যাগে ভরে টাকাটা লুকিয়ে ফেললেন। গর্তের ওপর সবুজ ঘাস লাগিয়ে দিলেন। কদিন পর তার মনে হলো, জায়গাটা নিরাপদ নয়, কেউ খুঁজে বের করে ফেলতে পারে। তিনি ভিন্ন একটি গর্ত খুঁড়ে টাকা লুকোলেন।

গ্রাফিক্স: ইজেল

বিংশ শতকের রাজনৈতিক ঠাট্টা-মশকরা

আন্দালিব রাশদী

জেনারেল জর্জিও পাপাডোপুলাস (১৯১৯-১৯৯৯) বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রিগেডিয়ার স্টাইলিয়ানোস প্যাটাকোসকে (১৯১২-২০১৬) সঙ্গে নিয়ে ১৯৬৭ সালে নিজ দেশ গ্রিসে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন। পাপাডোপুলাস হলেন প্রধানমন্ত্রী আর প্যাটাকোস উপপ্রধানমন্ত্রী। দুজনেই তখন রাজধানীতে একসঙ্গে অবস্থান করছেন। এ সময় গভর্নর দেশের সবচেয়ে বড় কারাগারে করিডালোসে বিরাজমান অস্থিতিশীল অবস্থা তাদের জানাতে এলেন।

কয়েদিদের অনেক ক্ষোভ জমে আছে। দাবি মেনে নেওয়া না হলে তারা অনশন ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে।

পাপাডোপুলাস জিজ্ঞেস করলেন, তাদের প্রধান দাবি কী?

গভর্নর বললেন, তারা প্রতি সপ্তাহে এক দিন যৌন তাড়না নিবৃত্তির জন্য স্ত্রীদের কাছে পেতে চায়।

পাপাডোপুলাস বললেন, বলে দাও তাদের দাবি মঞ্জুর।

তার নমনীয়তায় প্যাটাকোস অবাক ও ক্ষুব্ধ হলেন।

এক সপ্তাহ পর গভর্নর আবার এসে বললেন, অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে, কয়েদিরা তাদের সেলে একটি করে টেলিভিশন চাচ্ছে। দাবি না মানলে তারা ধর্মঘটে যাবে।

পাপাডোপুলাস রাজি হয়ে গেলেন এবং টেলিভিশন সরবরাহের নির্দেশ দিলেন। উপপ্রধানমন্ত্রী প্যাটাকোস থ হয়ে রইলেন। এসব কি মেনে নেবার মতো আবদার?

এক সপ্তাহ পর গভর্নর এসে বললেন, আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে, কয়েদিরা ডেনমার্কের মতো সাপ্তাহান্তের জন্য কারামুক্তি চায়। বাইরে উইকএন্ড কাটিয়ে আবার জেলে ঢুকবে।

পাপাডোপুলাস সম্মতি দিলেন। কিন্তু প্যাটাকোস আর নীরব থাকতে রাজি নন। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, কী আশ্চর্য! কয়েদিদের প্রতি এমন সদয় হবার মানে কী? আমরা সদয় হব স্কুলের প্রতি, কারাগারের প্রতি নয়।

পাপাডোপুলাস বললেন, মাথা গরম করবেন না, এখান থেকে আমরা স্কুলে ফিরব না।

বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। ১৯৭৩ সালে অভ্যুত্থানে পাপাডোপুলাস ক্ষমতাচ্যুত হন, দুজনই গ্রেপ্তার হন। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দুজনের মৃত্যুদণ্ড হয়। পরে আপিল আদালত মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। জেনারেল পাপাডোপুলাস কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। কুড়ি বছর কারাবাসের পর প্যাটাকোসকে শর্তযুক্ত মুক্তি দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম প্রেসিডেন্ট সাবেক হলিউড অভিনেতা রিপাবলিকান দলের রোনাল্ড উইলসন রেগান। জন্ম ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১১, ইলিনয়; মৃত্যু ৫ জুন ২০০৪ লস অ্যাঞ্জেলেস। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ দুই টার্ম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ৩০ মার্চ ১৯৮১ আততায়ীর গুলিতে মারাত্মক আহত হয়েও বেঁচে যান। আর ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮০৯-৪ মার্চ ১৮৬৫) ফোর্ড থিয়েটারে নাটক দেখার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

প্রেসিডেন্ট রেগান মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, অস্থির বোধ করছেন, নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তাকে সন্দিহান করে তুলেছে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি রাতের বেলায় রাজধানীর রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করলেন। তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের সামনে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, মান্যবর জর্জ ওয়াশিংটন, আমি এখন কী করব?

সৌধের ভেতর থেকে গভীর স্বর ধ্বনিত হলো, রোনাল্ড রেগান তুমি কংগ্রেসের কাছে যাও।

আরও কিছুদূর এগিয়ে তিনি দেখলেন, জেফাবসন মেমোরিয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মান্যবর টমাস জেফারেসন, আমি এখন কী করব?

গভীর স্বর শোনা গেল, রোনাল্ড রেগান, তুমি জনগণের কাছে যাও।

তবুও রেগানের অস্থিরতা কাটল না। হাঁটতে হাঁটতে তিনি লিঙ্কন মেমোরিয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবারও একই প্রশ্ন করলেন, মান্যবর আব্রাহাম লিঙ্কন, আমি এখন কী করব?

ঠিক তখন স্মৃতিসৌধের গভীর তলদেশ থেকে ধ্বনিত হলো, রোনাল্ড রেগান, তুমি এখনই থিয়েটারে চলে যাও।

তখন জোসেফ স্ট্যালিনের আমল। বিশাল রাষ্ট্র ইউনাইটেড সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক।

স্ট্যালিনের রাজত্বে একজন মানুষ মস্কোর রাস্তায় ছুটছে আর চিৎকার করছে: 'কেবল একজন মানুষের জন্য গোটা পৃথিবী আজ ভুগছে। কেবল একজন মানুষের জন্য।'

তাকে গ্রেপ্তার করে কেজিবির জিম্মায় দিয়ে দেওয়া হলো। টেনেহেঁচড়ে তাকে নেওয়া হলো ইন্টারগেশন সেলে।

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রাস্তায় চিৎকার করতে করতে কী বলছিলে? তার জবাব: আমি বলছিলাম কেবল একজন মানুষের জন্য গোটা পৃথিবী আজ ভুগছে। কেবল একজন মানুষের জন্য।

প্রশ্নকর্তা বললেন, কিন্তু কে সেই লোক, আপনি যার কথা বলতে চাইছেন?

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নিজের পরিণতি বুঝতে বাকি নেই। তিনি বললেন, কী বলতে চাচ্ছেন, কার কথা বলছি মানে? *এরপর পৃষ্ঠা ১০*